প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

Subject : Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - I (Introducing Sociology)
Module-4 :Social Change, Globalization and Mass Media

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

Subject : Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - I (Introducing Sociology)
Module-4 :Social Change, Globalization and Mass Media

: Board of Studies :
Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences,
Netaji Subhas Open University (NSOU)
Professor Bholanath Bandyopadhyay
Retired Professor, Deptt. of Sociology,
University of Calcutta
Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Deptt. of Sociology,
University of Calcutta
Kumkum Sarkar
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU
Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology
NSOUR
Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor, Deptt. of Sociology,
Presidency University
Professor S.A.H. Moinuddin
Deptt. of Sociology,
Vidyasagar University
Ajit Kumar Mondal
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU
Anupam Roy
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

: Course Writer :
Dr. Sudarsana Sen
Assostant Professor in Sociology
Gourbango University

: Course Editor :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology
NSOU

: Format Editor :
Dr. Srabanti Chaudhuri
Assitant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this Study material be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University

Kishore Sengupta
Registrar

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Subject : Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - I (Introducing Sociology)
Module-4 :Social Change, Globalization and Mass Media

পর্যায় :

একক 1	❑	সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে?	9-20
একক 2	❑	সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ	21-29
একক 3	❑	সামাজিক বিবর্তন, সামাজিক প্রগতি ও সামাজিক উন্নয়ন	30-37
একক 4	❑	সামাজিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ণ ও গণমাধ্যম	38-46

Module : 4

Social Change, Globalization and Mass - Media

(সামাজিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম)

Module Writer :
Dr. Sudarshana Sen

একক ১ ❑ সামাজিক পরিবর্তন; জনসংখ্যানগত, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক কারণ সমূহ। সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? (Social Change; Demographic, Technological, Cultural. What is Social Change)

গঠন

একক ১.১ উদ্দেশ্য

একক ১.২ ভূমিকা

একক ১.৩ সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

একক ১.৪ সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি

একক ১.৫ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহ

১.৫.১ জনসংখ্যানগত উপাদান

১.৫.২ প্রযুক্তিগত উপাদান

১.৫.৩ সাংস্কৃতিক উপাদান

একক ১.৬ উপসংহার

একক ১.৭ প্রশ্নাবলী

একক ১.১ ❑ উদ্দেশ্য (Purpose of the Module)

সমকালীন সময়ে বিশ্ব জুড়ে যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে সমাজতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে আমাদের 'সামাজিক পরিবর্তন কি'? এই বিষয়টির ওপর গভীর ও বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এই মডিউলটিতে আমরা সামাজিক পরিবর্তন কি, সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান, সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন তত্ত্ব, সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণ অন্য সমপর্যায়ের ধারণা যেমন সামাজিক বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়নের ধারণা ও সবশেষে বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম সম্বন্ধিত আলোচনা করবো।

একক ১.২ ❑ ভূমিকা (Introduction)

সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি এমন সমাজ পাওয়া আজ দুষ্কর। সামাজিক পরিবর্তন সর্বকালেই ঘটেছে। সামাজিক পরিবর্তনের আওতায় পড়েনি এমন সমাজ নেই। সমাজতত্ত্বে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা এ কারণেই

অত্যন্ত জরুরি। সমাজতত্ত্বের একটি কেন্দ্রিয় সমস্যা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুরুত্বপূর্ণ হল কীভাবে এই সময়ের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন — গণতন্ত্র ও শিল্পায়ণকে ব্যাখ্যা করা যায়। ফলে, সমাজতত্ত্বে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ ও বিন্যাসের রূপ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। আগস্ট কোঁত, হার্বার্ট স্পেন্সর ও কার্ল মার্ক্স প্রদত্ত তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে সামাজিক পরিবর্তন কি ও কেন হয় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। কেন হয়? সামাজিক পরিবর্তন কি করে হয়? এই প্রশ্ন দুটির উত্তর আমরা খুঁজব প্রথম ইউনিটটিতে, যেখানে আমরা আলোচনা করব সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান। এরপর, সামাজিক পরিবর্তনের কারণ অন্বেষণে সমাজতাত্ত্বিক ও সামাজিক চিন্তাবিদ্‌রা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা নিয়ে আলোচনা দ্বিতীয় ইউনিটের বিষয়বস্তু। সামাজিক পরিবর্তন কি এবং কেন এই প্রশ্নের পর সামাজিক পরিবর্তন আলোচনায় অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে পড়ে একইভাবে আলোচিত সমপর্যায়ের ধারণাগুলি যেমন সামাজিক বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়নের ধারণা। এই বিষয়বস্তুই হলো ইউনিট তিন, বা তৃতীয় ইউনিটের আলোচ্য বিষয়। শেষে আলোচনায় আসবে আজকের সময়ে সামাজিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে বিশ্বায়নের ধারণা ও বিশ্বায়ন কিভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষত গণমাধ্যমকে হাতিয়ার করে পরিবর্তন আনছে, সেই প্রসঙ্গ।

একক ১.৩ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা (Definition of Social Change)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামোয় বদল ঘটলে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলা যায়। অর্থাৎ যে কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রক্রিয়া, কাঠামো বা সামাজিক প্রক্রিয়ায় যে কোনো ধরণের বদল, রূপান্তর বা সংশোধন ঘটলে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলা যায়। সামাজিক পরিবর্তন প্রগতিশীল বা পশ্চাদ্‌গতিসম্পন্ন, স্থায়ী বা অস্থায়ী, পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত, একমুখী বা বহুমুখী, শুভফলদায়ী বা ক্ষতিকারক যে কোনো কিছুই হতে পারে। আবার সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত, আমূলসংস্কারবাদী, ধীরগতিসম্পন্ন ও ক্রমিকও হতে পারে। সমাজাত্ত্বিকরা মনে করেন সামাজিক পরিবর্তন স্বাভাবিক ও ধারাবাহিক একটি বিষয়। সামাজিক পরিবর্তন মানুষের জীবনকে তার বিভিন্ন পর্যায়ে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। এই পরিবর্তন অধ্যয়নে বহুপর্যায়ে, বিভিন্ন এককে নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বর্তমানে আমরা যে সমাজকে দেখি এক হাজার বছর আগে এই সমাজ একই রকম ছিল এমন নয়। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের একটা গভীর যোগাযোগ আছে। আজ যা পরিচিত, নতুন, চেনা বা স্বাভাবিক আগামীতে এটাই হয়ে যাবে পুরনো, অপরিচিত, প্রাচীন। সুতরাং পরিবর্তন সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিদিন ধীরে ধীরে পাল্টে যাওয়া সামাজিক পরিস্থিতি থেকেই সময়ান্তরে পরিবর্তনকে তখনই চোখে পড়ে যখন সমাজের মৌলিক ভিত্তিসমূহ যেমন পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে কল্পনাতীত পরিবর্তন বা বদল দেখা যায়। এ পরিবর্তনের দিশা নির্দেশ করা বা কোন্ নীতিতে পরিবর্তন হবে তা ঠিক করা কিন্তু সহজ নয়।

বেশিরভাগ সময়ই বলা হয় যে প্রকৃত বিজ্ঞান সেটিই যা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। কিন্তু এই বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। যদি ভবিষ্যদ্বাণী বলতে বোঝায় বৈচিত্র্যের ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রক্রিয়ার আবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী

নয়, তবেই এ কথা গ্রহণ করা যেতে পারে। তার কারণ সামাজিক পরিস্থিতি এতটাই অস্থির ও জটিল যে ভবিষদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সমাজ বিজ্ঞানে এতটুকুই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে পরিবর্তনের গতি বা প্রবণতা কি? সমাজ সময় নির্ভর। অর্থাৎ সময়ের অন্তরে সমাজের চেহারা বদলাতে থাকে। সমাজ একটি প্রক্রিয়া, কোন উৎপাদন নয়। যদি এমন হয় যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর মত কোনো মানুষ আর জীবিত নেই তবেই সমাজের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ যদি কোনো মানুষ না থাকেন যারা সামাজিক প্রথার পালন করবেন তবেই প্রথার অবলুপ্তি হবে। সমাজ শুধুমাত্র কার্য-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই জীবন্ত থাকে বলেই কোনো সমাজ কাঠামোকে সংরক্ষণ করা যায় না। বর্তমান সম্পর্কগুলির পরিবর্তনশীল ভারসাম্যের ওপরই সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে। এ কারণে সামাজিক বিষয়ের অধ্যয়ন সাংস্কৃতিক বা সভ্যতার অধ্যয়নের থেকে আলাদা। কোনো সভ্যতার নিদর্শন সংরক্ষণ করা গেলেও সামাজিক নিদর্শন সংরক্ষিত থাকে মানুষের সৃষ্টিতে, গানে, কবিতায় বা সুরে।

একটি সমাজ কাঠামো বর্তমান সম্পর্কের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে গঠিত একটি জাল। বর্তমান সময়ের মানুষ চাইলে এই জাল সংরক্ষিত থাকবে নচেৎ নয়। একটি মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে এই জাল সবসময়ই বোনা হচ্ছে ভাঙা হচ্ছে ও পরিবর্তিত হচ্ছে, বা কখনো নতুন উপাদান সংযোজিতও হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই জাল বোনা চলতেই থাকে। মানুষের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি যদি না বদলায় তবে সমাজ কাঠামোতে কোনো বদল বা পরিবর্তন আসে না। প্রাচীন সমাজকে সাধারণ চোখে স্থিতিশীল মনে হলেও সেই প্রাচীন সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেই কিন্তু আজকের এই সমাজ। যে উপাদানগুলি সেই বাস্তব পরিস্থিতির বদল করে আজকের এই সমাজে পর্যবসিত করেছে সেই উপাদানগুলির অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরী। সেই বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তনই সূচিত করে সার্বিক অর্থে সমাজের পরিবর্তনকে। এই অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন বলতে যে পরিবর্তনশীলতার নিরিখে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে, যে প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলিতে পরিবর্তন ঘটে যা সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করে সেই শক্তিগুলিকে আলোচনা করা। সামাজিক পরিবর্তন কি? এই প্রসঙ্গটিকে দীর্ঘায়িত না করে পরিবর্তনের কয়েকটি রূপ ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত জটিলতাকে বোঝার চেষ্টাও করা দরকার। প্রথমে, আলোচনার বিষয়বস্তু হল পরিবর্তনের রূপ। ধরা যাক, কোনো আবিষ্কার। যেমন, ইলেকট্রিক বাতি। বাতি একদিন একজন আবিষ্কার করেছেন এ কথা ঠিক। কিন্তু এই একদিনের আবিষ্কারের পেছনে একটা দীর্ঘ প্রচেষ্টার ইতিহাস আছে। এই আবিষ্কারটি সেই দীর্ঘ ক্রমযৌগিক প্রচেষ্টার ফলাফল। এই চেষ্টার ফল যে ইলেকট্রিক বাতি, সেই বাতি একবার আবিষ্কারের পরও সেই বাতিতে অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে। অর্থাৎ এই সংক্রান্ত জ্ঞান কিন্তু একটা জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে থাকে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা বাড়তে থাকে, আরো জটিল হতে থাকে এবং তার বহু ধরণের শাখা, বিস্তার ও ব্যাপ্তি ঘটে। আবার এই যে ধারাবাহিকতার ধারা যা ক্রমশ জটিল হচ্ছে তার মাধ্যমে এই ধারা যেমন প্রগতিসাধক ও সদর্থক তেমন বহু সময়ের গতিপথ অতিক্রম করে সব সময় একমুখী, সদর্থক, প্রগতিশীল ও উন্নয়নমুখী থাকে এমন নয়। অর্থাৎ পরিবর্তন ভাঙা গড়া, হ্রাস-বৃদ্ধির দোটানার মধ্যে দিয়েও এগোতে পারে। যেমন বাতির আবিষ্কার ও শহর গড়ে ওঠার মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে যা একে অপরের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আবার কখনো আবর্তকালীন গতিপথ ধরেও পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন, জন্ম-মৃত্যু-অভিবাসনের হ্রাস-বৃদ্ধি, এর পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়েও বারবার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

এবার আসা যাক, সামাজিক পরিবর্তন যে একটি জটিল বিষয় সেই আলোচনায়। যখন, আমরা সামাজিক পরিবর্তনকে ধারাবাহিকতার নিরিখে দেখি তখন সামাজিক পরিবর্তন একটি প্রক্রিয়া (process)। একটি পরিস্থিতিতে প্রথম থেকে কোনো শক্তির উপস্থিতিতে ধারাবাহিক ভাবে পরিবর্তন হলে তাকে প্রক্রিয়া বলে। সুতরাং অভিযোজন (accommodaton) ঐক্য বা সংহতি (integration) অসংহতি (disintegration) ও অসংগঠন (disorganization)-এর মধ্যে দিয়ে কোনো গোষ্ঠীর যূথ জীবনের যাপনকে 'প্রক্রিয়া' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। পরিবর্তন এক্ষেত্রে একটি অবস্থা থেকে অন্য একটি অবস্থায় বদল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই দুটি পরিস্থিতি পশ্চাদ্বর্তী ও অগ্রবর্তী দুটি পর্যায়ই যে হবে সে কথা মনে করার কোন কারণ নেই। সামাজিক পরিবর্তনকে প্রক্রিয়া হিসাবে দেখলে পর্যায়ান্তরে কিভাবে একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় গমন ঘটেছে সেটাই আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। আবার এই একই পরিবর্তনকে প্রক্রিয়া হিসাবে দেখতে গেলে একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় গমনকে বিবর্তন হিসাবেও দেখা যেতে পারে। বিবর্তন কিন্তু শুধুমাত্র বৃদ্ধি নয়, যে অর্থে জীববিজ্ঞানী বিবর্তনকে আলোচনা করেন। সমাজতাত্ত্বিকরা বিবর্তনকে আয়তনের বৃদ্ধি ছাড়াও কাঠামোর পরিবর্তন হিসাবেও দেখেন। এক্ষেত্রে অগ্রবর্তী, পশ্চাদ্বর্তী, উচ্চতর—নিম্নতর, প্রগতি-প্রত্যাবৃত্তি হিসাবে আলোচনা করা হয়। যখন আমরা সমাজতাত্ত্বিকরা বিবর্তনের মাপকাঠিতে প্রাচীন ও আধুনিক পর্যায়ে সমাজকে পৃথক করে পরিবর্তনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করি তখন কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজের এগিয়ে চলার পথকে প্রগতি বলে চিহ্নিত করে থাকি। এক্ষেত্রে কোনো নৈতিকতার মাধ্যমে এই লক্ষ্য স্থির হয় এমন নয়, বরং এই পরিবর্তন প্রত্যাশা পূরণে পরিবর্তন বা বদল। আরো যে একটি বিষয় সামাজিক পরিবর্তনের জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করে তা হলো অভিযোজন (adaptation)। অভিযোজন কিন্তু বিবর্তন (evolution) নয়। দুটি সামাজিক ব্যবস্থা এক ধরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দুটি সমাজেই একে অপরের সঙ্গে যে সমন্বয় ও সমঝোতা গড়ে তোলে তাকে অভিযোজন বলা হয়।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম যে সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজ যেভাবে সংগঠিত তার বদল। আমরা দেখলাম একটা আবিষ্কার কিভাবে অর্থনৈতিক বদল আনতে পারে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে পারে। আরো দেখলাম সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়ন একটি জটিল বিষয় কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরীও। এবার প্রশ্ন হলো সামাজিক পরিবর্তন কেন হয় বা এর চালিকাশক্তি কোনগুলি।

একক ১.৪ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি (Trajectories of Social Change)

সামাজিক পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে যে প্রক্রিয়াগুলিকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি হলো শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমীকরণ। উইলবার্ট ম্যুরের মত সমাজবিজ্ঞানীরা শিল্পায়নকে সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করছেন। ম্যুর শিল্পায়নের সঙ্গে আধুনিকতাকেও যুক্ত করেছেন এই প্রক্রিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে। তিনি মনে করেন শুধুমাত্র শিল্পায়ন যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটায় তাই নয় এক ধরণের সংস্কৃতি গঠনেও শিল্পায়ন বিশেষ ভূমিকা নেয়। ম্যুর দেখান যে সম্পদের সঠিক ব্যবহার, বাণিজ্য ও আর্থিক সংগঠনের গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৈচিত্রপূর্ণ সম্ভার, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যুক্তিবাদিতা

ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশ এইগুলির মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা শিল্পায়নের পক্ষে জরুরী। তবে, যেহেতু একটি যে কোনও শিল্পনির্ভর জনসমষ্টির ধারাবাহিকতার সঙ্গে কৃষিভিত্তিক উদ্বৃত্তের প্রয়োজন হয় সেহেতু শিল্পায়নের মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রযুক্তি ও যৌক্তিক চিন্তা-কাঠামো কৃষিক্ষেত্রেও উন্নতিসাধন ঘটায়। এইভাবে শিল্পনির্ভর ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকলে ধীরে ধীরে যে কোনো জীবনধারণ সাপেক্ষ অর্থনীতিরও (subsistance economy) উন্নতি ঘটবে বলে ম্যুর মনে করেন। অর্থাৎ যে অর্থনৈতিক অবস্থায় শুধুমাত্র জীবনধারণই সম্ভব, সেই অর্থনীতিতে শিল্পায়ন ঘটলে জীবনধারণ সাপেক্ষ উৎপাদন থেকে বাণিজ্যভিত্তিক উৎপাদন ঘটবে, টাকা বা অর্থের বিনিময়ে লেনদেন শুরু হবে, এবং খাদ্য উৎপাদন থেকে অনেক শ্রমিকই নির্মাণ বা যন্ত্র উৎপাদনে ও পরিষেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে চাইবেন। তার ফলে শিল্পায়নের কারণে বিপুল পরিমাণে প্রব্রজন (migration) ঘটবে যার কারণে আত্মীয়তা বন্ধনের সাংগঠনিক রূপ ও কাঠামোয় বদল আসবে, বৃহৎ পরিবারগুলি ক্রমশ ছোট ছোট পরিবারে ভেঙে যাবে। পাশাপাশি শিল্পায়নের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে, বিজ্ঞান ভাবনা ও গবেষণায় উন্নতি ঘটবে, শ্রমশক্তি ক্রমশ আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠবে এবং সার্বিক পেশা কাঠামোয় পরিবর্তন আসবে। ফলে শিল্পায়নের পথে হাঁটলে যে কোনো জীবনধারণ সাপেক্ষ অর্থনীতিতেও পরিবর্তন আসবে বলে ম্যুর মনে করেন।

সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে শিল্পায়নের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো নগরায়ণ। এই প্রক্রিয়াটিও সামাজিক ব্যবস্থায় ঐতিহ্যবাহিতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে। নগরায়ণ প্রক্রিয়া সামাজিক পরিবর্তনের অনেকগুলি বাহ্যিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান উপাদান। নগরায়ণের ফলে নগর কেন্দ্রগুলিতে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, অর্থনৈতিক ও পেশাগত এবং পৌর ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধির ফলে, নগর সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হয়। যা যে কোনো ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তনে সক্ষম। বিশ্বের কাছে ব্যক্তিকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও নগরায়ণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের দরবারে নাগরিক এক নতুন স্বাদ পান যার ফলে তিনি গ্রহণ করেন অনেক কিছুই। এর ফলে সাংস্কৃতিক বিক্ষেপণ (cultural diffusion) ঘটে, এমনকি সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত, সাংগঠনিক ও ভাবাদর্শগত পরিবর্তনও আসে। যে কোনো শহরই আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু শহর গ্রামীণ এলাকা থেকে বহু সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে, গণমাধ্যমের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন আকর্ষণের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে তারা জানতে পারেন, রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রতি শহর গ্রামীণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বা তাদের প্রভাবিত করতে পারে বলে, উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যের সুবিধা দিতে পারে বলে, গ্রামীণ মানুষ শহরে চলে আসার ক্ষেত্রে সহজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ফলে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শহর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে ও ক্রমশ বিশাল আকার নেয়। বহু মানুষের আগমনের ফলে শহরে পেশার বিভেদকরণ ঘটে ও এর ফলে সনাতনী স্তরবিন্যাসী ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। একটি গ্রামীণ এলাকার সংস্কৃতিগত দিক থেকে নিবিড় আত্মীয়তাবন্ধন নির্ভর, পরিবার ও ধর্মকেন্দ্রিক ব্যবহারের যে বিন্যাস থাকে, শহরে সেই জোটবদ্ধতা শিথিল হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে সফল হওয়ার লক্ষ্যে অ-অর্থনৈতিক যে কোনো বাঁধনই ক্রমশ আলগা হয়ে যায়। কিন্তু শহরের বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থায় প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিকের, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিগত পরিসরের থেকে মুক্ত নিরপেক্ষ চিন্তার। যার ফলে, ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। শহর যে আধুনিকীকরণের প্রধান আকড় এ কথা জোরের সঙ্গে বলতে না

পারলেও এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শহরের সাংগঠনিক কাঠামোয় যে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নিহিত থাকে বা প্রতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর প্রভাব যে ভাবে বিস্তৃত থাকতে পারে, তা শিল্পায়ন ও সামাজিক উদ্‌যোজনের (social mobilization) পক্ষে সদর্থক। মনে রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে নগরায়ণের গভীর সহসম্পর্ক আছে। তবে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে নাগরিক বিস্ফোরণ উন্নয়নের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিস্থিতি নয়। তার কারণ অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া শহরের আধুনিকীকরণের প্রতি সদর্থক ভূমিকার সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক সময়ই মনে করা হয় যে শিল্পায়ন, নগরায়ণের পূর্বসূরি। অর্থাৎ প্রথমে শিল্পায়ন ঘটলে তার হাত ধরেই নগরায়ণ ঘটে। শিল্পায়নই নাগরিক বিস্ফোরণ ঘটায়, শহরের প্রকৃতি কি হবে তা নির্ণয় করে দেয়, নগরায়ণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পর্যায় কী হবে তাও নির্ণয় করে। শিল্পায়নের মাধ্যমেই পার্থিব বস্তুগত শক্তির ব্যবহার ঘটে, উৎপাদনের পদ্ধতি শ্রমনির্ভর থেকে পুঁজি-নির্ভর উৎপাদনে পরিবর্তন সাধিত হয়, শ্রমশক্তি ধীরে ধীরে প্রাথমিক জীবনধারণ সাপেক্ষ উৎপাদন থেকে গৌণ ও বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়, পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সৃষ্টিশীল ব্যবস্থার প্রচলন হয় যেমন, খুচরো ব্যবসা, স্বাধীন বিজ্ঞাপন এজেন্সি, বিক্রি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, পেশাভিত্তিক এজেন্সি, সরকারের ভূমিকার বিস্তৃতি, সামাজিক পরিষেবা ও কল্যাণমূলক কাজের বৃদ্ধিও ঘটে। এছাড়াও বিনোদন ব্যবস্থাতে পরিবর্তন ও অবসর যাপনের বিভিন্ন উপাদানেরও সৃষ্টি হয়। ফলে নগরজীবন হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক। এই কারণে নগরায়ণ সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিকরা আধুনিকীকরণকে বিবর্তনের প্রেক্ষিত থেকে আলোচনা করেন। অর্থাৎ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুরৈখিক পরিবর্তনের পথে সনাতনী সমাজের আধুনিক সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আধুনিকীকরণকে এমন এক প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যেখানে সনাতনী জীবনধারায় অভ্যস্ত মানুষ ক্রমশ শিল্পায়িত সমাজ, পশ্চিমী জীবনধারাকে গ্রহণ করতে থাকেন। আধুনিকীকরণ একটি বহুস্তরিত উন্নয়নের প্রক্রিয়া যার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘাতমাত্রা (dimension) দেখা যায়। যৌক্তিক উপায়ে দাম বা মূল্য নির্ধারণ ও হিসাবের নীতি, প্রযুক্তির সাহায্যে প্রযোজনীয় দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটানো, যৌক্তিক ভাবে আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের বিস্তার, টাকার বিনিময়ে ভোগবাদিতার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনোর চেষ্টা এ সবই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি। এছাড়াও শ্রমের সচলতা রক্ষা, বাজার ব্যবস্থায় যোগাযোগ ও পরিবহণের উন্নতি ও সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রয়োগ ঘটানোও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রযোজনীয় উপাদান। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ বলতে গৌণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের অধিগমন এবং ত্রিপর্যায়ী ক্ষেত্রে উৎপাদনে অংশগ্রহণও বোঝায়। যান্ত্রিকতার ব্যবহার ক্রমশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় সনাতনী কৃষি উৎপাদনের থেকে বিশ্ব বাজারে জায়গা করে নেওয়ার জন্য কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এই প্রক্রিয়ার অন্যতম হাতিয়ার। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেই যে আধুনিকীকরণ ঘটে এমন কথা বলা যায় না। সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ বলতে বোঝায় পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বিশ্বাস, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে জ্ঞান ধর্মী বিপ্লব ঘটানো। যেহেতু নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে চাওয়া সাধারণ মানুষ দায়বদ্ধ আত্মীয়তাবন্ধনকে ছিন্ন করে এগিয়ে চলেন সেহেতু তারা সনাতনী দায়ভারের পরিবর্তে বিধিবদ্ধ চুক্তিনির্ভর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। পরিবারগুলির আয়তন ক্রমশ ছোট হতে থাকে, ফলে একাকী পরিবার ও সমতাবাদী সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। এই সমতার প্রশ্নে অধিকতর দুর্বল সামাজিক অংশকে ক্ষমতায়িত করার প্রশ্নটিও গুরুত্ব

পায়। রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটে, সাধারণ মানুষের অনেক বেশি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঘটে, তারা গণমাধ্যমের প্রচারে আগের তুলনায় বেশি প্রভাবিত হন, প্রত্যাশার পারদ চড়তে থাকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু অংশে স্থিতাবস্থা রক্ষিত হয় এবং মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় সংক্রান্ত ধারণাগুলির সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে আগের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবহার ও আচার আচরণেও আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লাগে। সনাতন পন্থী আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন আসে। যেমন ধর্মীয় ও প্রথাগত বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞান নির্ভর ধর্মনিরপেক্ষ, যৌক্তিক ভাবনার উন্মেষ ঘটে।

একক ১.৫ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদন সমূহ (Factors of Social Change)

১.৫.১ জনসংখ্যানগত উপাদান (Demographic Factors)

যে কোনো সমাজের জনসংখ্যায় সবসময়ই সংখ্যা ও গঠনে পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঊনবিংশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই জনসংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি ঘটেছিল। একই সময়ে এই দেশগুলিতে মৃতের সংখ্যাও কমতে থাকে। মানব ইতিহাসে এই ঘটনা বিরল। যে কোনো সমাজে অভিবাসন বা পরিযান (migration), আক্রমণ (Invasion), যুদ্ধ (war) ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে জনসংখ্যায় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। কখনো কখনো এর জন্য জনসংখ্যার স্ফিতি বা কখনো বৃদ্ধি ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে বিশ্বজুড়ে জন্মহার এমন বৃদ্ধি পায় যা আর কখনো দেখা যায়নি। সেই সময় থেকে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জন্মহারের সম্পর্ককেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে (ম্যাকাইভার ও পেজ ২০০৯, ৫৩০-২) যেহেতু জনসংখ্যার ব্যাপ্তির ফলে জন্ম, মৃত্যু ও অভিবাসনের ওপর নির্ভর করে সেহুতে জন্মহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসনের প্রকৃতি জনসংখ্যার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, যখন জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে তখন অল্প বয়সী মানুষের সংখ্যাও কমতে থাকে। আবার অঞ্চলভেদে জন্মহার ও মৃত্যুহার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এক একটি অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিভুক্ত মানুষ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ, এক এক ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করেন। এর ফলে সেই সব অঞ্চলে শুধুমাত্র জন্ম মৃত্যুই নয় অভিবাসনেরও প্রভাব এই সব অঞ্চলের জনসংখ্যার ওপর পড়ে এবং পাশাপাশি এই সব অঞ্চলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যার আয়তন ও গঠন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হয়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতে হয় যে সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক ব্যবহারে পরিবর্তন নিয়ে আসে জন্মহার, মৃত্যুহার এমনকি বিবাহের হারও। যেমন যেসব দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেই চলেছে, এবং যেখানে সম্পদের সম্ভার সীমিত সেখানে জন্মহার ও মৃত্যুহারের যে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধিই এলাকার সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোয় প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন, বলা যেতে পারে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি মানুষের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করলে মানুষের ব্যবহারে পরিবর্তন আসতে পারে। ঠিক যে কারণে উনবিংশ শতাব্দে জনসংখ্যায় অকল্পনীয় বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নের নতুন দিশারী হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ গুরুত্ব পায় (ঐ, ৫৩৭)। এর ফলে বহু পরিবারের

আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ফলে, পরিবার ক্রমশ ছোট হওয়ার কারণে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই দেখা যায়। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক, সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতি, পরিবারে মায়ের ভূমিকা, পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতার দিক সবই পরিবর্তিত হয়।

কোনো সমাজের জনসংখ্যা তখন বৃদ্ধি পেতে পারে যখন সেই জনসংখ্যার পুষ্টি ও স্বাস্থ্যজনিত বিষয়গুলির উন্নতি হয়। কোনো এলাকায় জনসংখ্যা ক্রমশ ঘন হয়ে এলে সেই জনসম্প্রদায়কে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজনগুলিরও যোগান সমানভাবে দেওয়া দরকার হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে জনসংখ্যার চাপ সহ্য করে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির ব্যবস্থা ও সমবণ্টন করাও কঠিন বিষয় হয়ে উঠছে। পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে ও মানুষের জীবৎকালীন সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা সব বিষয়গুলিই সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা প্রশাসনকে করতে হয়। এর আগে বা এখনো কোথাও কোথাও আমরা দেখি যে খাদ্যের অভাবে, অসুখের কারণে জনসংখ্যায় বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে। আবার কখনো যুদ্ধও সংগঠিত হয়েছে একটি গোষ্ঠীর হাত থেকে সম্পদ বণ্টনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। আজকের সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব কোনো এলাকার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে এক বড় ধরণের ফারাক গড়ে দেয়। যেমন, ইউরোপে এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্যের খোঁজে, স্থিতাবস্থার লক্ষ্যে বহু মানুষ পাড়ি দিলেন ২০১৫-১৬ সালে।

সুতরাং জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়, এর সঙ্গে সমাজ জড়িয়ে থাকে বলে, সময়ের অন্তরে সমাজের মধ্যে তার ছায়া পড়ে। আবার এর কারণে সমাজকে, রাষ্ট্রকে নতুন পরিকল্পনার সাহায্যে জনসংখ্যার এই ওঠা-নামার ফলে সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।

১.৫.২ প্রযুক্তিগত উপাদান (Technological Factor)

১৯৪৭ সালে আতলান্তিক এলাকা ঘুরে দেখার জন্য সময় লাগত সাড়ে সতেরো ঘণ্টা। বর্তমানে তা সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেই ঘোরা হয়ে যায়। ১৯৯০-র দশক পর্যন্ত বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চিঠি পাঠাতে সময় লাগত দু' থেকে তিন মাস আর আজ সেই চিঠি সেই মুহূর্তেই পৌঁছে যাচ্ছে। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। প্রযুক্তি যে পরিবর্তন আনে সেই পরিবর্তন আমরা চোখে দেখতে পাই। যেমন ধরুন স্যাটেলাইট টেলিভিশন কীভাবে আমাদের সংস্কৃতিকে বদলে দিচ্ছে যা আমরা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন একমুখী ভাবে বহু সময় ধরে, ধারাবাহিকতার সঙ্গে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে বলে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। একইসঙ্গে এই পরিবর্তনকে আমরা পরিমাপ করতে পারি, অন্যকে দেখাতে পারি এবং এই বাস্তব বলে যৌক্তিক মনে এর প্রভাব পড়ে।

আমাদের সমাজে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। যেমন, অটোমোবাইল শিল্প পারিবাহিক ছুটি কাটানোর ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর যাত্রা থেকে রেহাই দিয়ে পথে গাড়ি করে বেরোনোর খুশি এনে দিয়েছে। প্রযুক্তি যে যান্ত্রিকতা আমাদের দান করেছে তা আমাদের জীবনযাপনে, চিন্তা ও মননে অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে সে কথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই। শিল্পায়ন গৃহভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার

পরিবর্তন এনেছিল, মেয়েদের বাড়ির বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মেয়েদের কাজকে আলাদা মর্যাদা দিয়ে তাদের মজুরি ও শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করেছে আলাদা ভাবে। এই নতুন পরিবেশে, মেয়েদের নতুন সামাজিক জীবন শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়াই। শিল্পায়নের পরবর্তীতে যান্ত্রিক সভ্যতা জীবনধারণের মানে পরিবর্তন এনেছে শুধু তাই নয় শ্রেণি কাঠামোতেও পরিবর্তন এনেছে, আঞ্চলিক লোকায়ত শিল্পকে নস্যাৎ করেছে, পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে অনৈক্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে, পরিবারকে ভাঙতে সাহায্য করেছে, নতুন ধরণের সম্পর্ক গঠনে উৎসাহিত করেছে, সম্পদ সৃষ্টি ও ক্ষমতার বিন্যাসকে নতুন করে সাজিয়েছে। এর কারণ কি? বা, কিভাবে যান্ত্রিকতা এই পরিবর্তনগুলি ঘটালো? বস্তুত যান্ত্রিকতা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে ব্যবহার, বিশ্বাস ও মানুষের জীবন-দর্শনে পরিবর্তন এসেছে। যে গুণগুলির সাহায্যে ক্ষমতা, সম্পদ, প্রতিপত্তি, সাফল্য গড়ে তোলা যায় বলে আগে বিশ্বাস করা হত, যান্ত্রিকতার ফলে সেই বিশ্বাসগুলিরই বদল হয়ে গেছে। বর্তমানে সাফল্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি গুণের থেকেও পরিমাণের ওপর আস্থাশীল। যেমন, গতির প্রতি যে ভালোবাসা মানুষের জন্মেছে তাতে চট্‌জলদি আনন্দ পাওয়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। ব্যবহারিক দিক থেকে জীবনকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে। জীবনের সমস্ত বিষয়ই মানুষের কাছে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়মাত্র। যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সব বিষয়ই উপায়ের উপায় যার কোনো শেষ নেই, কার্যকারিতারও কোন শেষ নেই, কোনো মূল্যবোধেরও কোনো মূল্য নেই।

প্রযুক্তির ব্যবহার কি ধরণের সামাজিক পরিবর্তন এনেছে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে প্রতিটি কাজে আরো বেশি দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার অনুভব ঘটিয়েছে, ফলে বিশেষীকরণের (Specialization) মাত্রা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। যত বেশি বিশেষীকরণ হয়েছে স্বাভাবিক কারণে তত বেশি শ্রম বিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সামাজিক সংগঠন অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে, আইন, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, মানুষের সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষত পেশা পরিবর্তনের প্রশ্নে, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় অস্থিরতা ও অস্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি মানুষের বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বহু সংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু প্রযুক্তিগত উপাদানের ফলে সামাজিক পরিবর্তনে সবই যে সদর্থক হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এর ফলে, বহু সামাজিক সমস্যারও জন্ম হয়েছে। যেমন, ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক অবস্থা, কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ, সুরক্ষার প্রশ্নে, সম্পদ বৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বের তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ইত্যাদি। এর আগে কখনো সমুদ্রে দূষণের ফলে রাতারাতি কোনো বিশেষ প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটেনি। মানুষের লোভ ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির ফলে, প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য, পরিবেশের বিশেষ ক্ষতিও হয়েছে।

১.৫.৩ সাংস্কৃতিক উপাদান (Cultural Factors)

প্রাক্-আধুনিক সমাজে পরিবর্তন যত ধীর গতিতে হয়েছে আধুনিক সমাজে তার গতি অনেক দ্রুত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নতুন নতুন প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছে। পাশাপাশি নতুন বিশ্বাস ও নতুন মূল্যবোধও পরিবর্তন এনেছে। যেমন ভাবনার পরিবর্তনে ওয়েবার দেখিয়েছেন অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে কাজের পরিবেশের বদলের ফলে

পুঁজিবাদের জন্ম হয়। আবার এও দেখা গেছে যে অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক পরিবর্তনের প্রাচীনতম উপায়ে পরিবর্তনের মাধ্যম ছিল সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। এই যোগাযোগের ফলে একটি সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির বিক্ষেপণ (diffusion) ঘটে অভিযোজনের মাধ্যমে। বর্তমানে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন দ্রুততার সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটায়। যেমন আজকের দিনে স্যাটেলাইট সুবিধার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এত উন্নতি হওয়ার ফলে, সারা বিশ্বই হয়ে উঠেছে একটি 'গ্রাম'। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে একটি সমাজ যতবেশি হারে অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসবে ততই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

মনে রাখতে হবে সাংস্কৃতিক উপাদান শুধুই যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হয় তাই নয় কখনও কখনও প্রযুক্তির পরিবর্তনেও নতুন দিক দেখাতে পারে। স্টাইলের বিভিন্ন প্রকাশে সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করে। স্টাইল সব সময় পরিবর্তিত হয় এবং সেক্ষেত্রে তার মূল্যও আংশিক। অর্থাৎ কোনো স্টাইলই চিরকালীন নয় এবং সবাইকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন নয়। সংস্কৃতি সেই সব ক্ষেত্রে মুক্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে যেখানে কর্তৃত্বকারী আধিপত্য নেই। সাংস্কৃতিক প্রকাশে সব সময়ই রক্ষণশীলতা ও সংস্কারধর্মী, উদারনৈতিকতা ও তপশ্চর্যা, শক্তিশালী গোঁড়ামি ও সহ্যক্ষমতার মধ্যে দ্বৈরথ চলে। বস্তুত এই টানাপোড়েনের কারণেই সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার উপস্থিতি আছে এমন কথা বলেন অনেকেই। এই কারণে বলা যায় যে সংস্কৃতি সব সময়ই চলমান এই কারণে নয় যে সভ্যতায় পরিবর্তন আসে, বরং এই জন্য যে পরিবর্তনশীলতা সংস্কৃতির ধর্ম।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে এই বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন, জামাকাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন, স্থাপত্যে পরিবর্তন যেভাবে বোঝা সম্ভব একইভাবে নির্বাচনে মানুষের রাজনীতি সম্বন্ধে মতামত বোঝা সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের ধারণায় যেভাবে অস্পষ্ট থাকে বা জনপ্রিয় দর্শন, মানুষের ভয় ও আশা একইভাবে পরিমাপ করে তার পরিবর্তন অনুধাবনও সম্ভব নয়। এই সাংস্কৃতিক উপাদান জনিত পরিবর্তন বোঝার জন্য যত্নের সঙ্গে সূচক (indices) গড়ে তোলাও জরুরী।

এই ধরণের পরিবর্তনের আড়ালে, প্রকৃত অর্থে, অনেক সময়ই মূল্যবোধের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটে এমন নয়। এই ধরণের পরিবর্তন ধীরে ধীরে বহু সময় ধরে হতে থাকে। বিশ্লেষণের খাতিরে বলা যায় এই ধরণের মূল্যবোধের পরিবর্তন সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থার (অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি) বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যোদ্ধা বা পুরোহিতদের মর্যাদা সমাজে অধিকতর কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক সমাজে অর্থনৈতিক উৎপাদনের মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় এই ক্ষেত্রে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের মর্যাদা সমাজে বেশি। এই ধরণের কাজ সমাজে সম্মান দেয়।

মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতি ও ভূমিকা পালনে পরিবর্তন আসে। সুতরাং যা চলমান ছিল সেই নমুনাগুলির রূপান্তর ঘটে। যেমন, স্বৈরতন্ত্রের বদলে সংসদীয় গণতন্ত্র নতুন এক পরিবর্তন নিয়ে আসল সেখানে পুরনো সব ভাবনা, মূল্যবোধ, সামাজিক ভূমিকা পালনের বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। প্রথম পর্যায়ে

পরিবর্তন গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে ঘটলেও ধীরে ধীরে তা সমাজের প্রচলিত ধারায় পর্যবসিত হয় এবং তখনই সেই পরিবর্তন 'স্বাভাবিক' হয়ে ওঠে।

ডব্লু. এফ. ওগবার্ন (১৯৪৬) বাস্তব পর্যায়ের পার্থিব সংস্কৃতি (material culture) এর সঙ্গে ধারণাগত পর্যায়ের অপার্থিব সংস্কৃতির (non-material culture) পার্থক্য দেখান। তিনি বলেন যখন পার্থিব সংস্কৃতিতে বদল আসে এবং এই বদল অপার্থিব সংস্কৃতিকে (মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি) আন্দোলিত বা প্রভাবিত করে, কিন্তু এই অপার্থিব সংস্কৃতি, পার্থিব সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, তখন যে পার্থক্য গড়ে ওঠে তাকে বলে সাংস্কৃতিক বিলম্ব (cultural lag) অর্থাৎ প্রযুক্তির পরিবর্তন যে সামাজিক পরিবর্তনকে সূচিত করে সেই সামাজিক পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি যদি সঠিক সময়ে, প্রয়োজনমত প্রতিক্রিয়া না করতে পারে তাহলে পার্থিব সংস্কৃতি ও অপার্থিব সংস্কৃতির পরিবর্তন সমপর্যায়ী না হওয়ার জন্য যে ফাঁক তৈরি হয় তাকে সাংস্কৃতিক বিলম্ব (cultural lag) বলা হয়। সমাজ একটি আন্তঃসম্পর্কের জাল হিসাবে কোনো একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন অন্য ক্ষেত্রগুলিকেও প্রভাবিত করে। প্রতিটি ক্ষেত্র সমানভাবে, একই সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে চললে তবেই সমাজ ব্যবস্থাটি কাজ করে। ফলে কোনো একটি ক্ষেত্র অন্য ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়লে চলে না। যখন প্রযুক্তি কোনো পরিবর্তন ঘটালেও সেই একই ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সেই পরিবর্তন কার্যকর হতে পারে না তখন তাকে প্রযুক্তিগত বিলম্বন (technological lag) বলা হয়। যেমন, কোনো নিগম যখন আয়তনে বৃদ্ধি করতে পারে না কিন্তু পরিচালন সমিতি নিগমের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হন। তখন কোনো সংগঠনের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে যে পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয় হয় সেই ব্যবস্থা তাকে বাড়তে সাহায্য করে না। ফলে, দক্ষতা বৃদ্ধি সফল হয় না।

একক ১.৬ ❑ উপসংহার (Conclusion)

সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক পরিবর্তনকে যেভাবে সমাজ সংগঠিত আছে তার যে কোনো বদলকে চিহ্নিত করেন। যে কোনো সংগঠনেই পরিবর্তন সার্বজনীন কিন্তু এই পরিবর্তন একই হারে হয় এমন নয়। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন, প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে ঘটে থাকে। সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়ন করার জন্য সমাজতাত্ত্বিকরা ব্যবহার ও সামাজিক কাঠোমোর যে কোনো বদলকেই আলোচনার বিষয়বস্তু করে থাকেন।

একক ১.৭ ❑ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ। (৬ নং)

(ক) সাংস্কৃতিক বিলম্বন (cultural lag) কাকে বলে?

(খ) নগরায়ণ কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে?

(গ) সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে?

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন। (১২ নং)

(ক) শিল্পায়ন ও নগরায়ণ কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় তা লিখুন।

(খ) সামাজিক পরিবর্তনে জনসংখ্যার পরিবর্তন কীভাবে প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করুন।

(গ) সামাজিক পরিবর্তনের প্রযুক্তিগত উপাদান সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখুন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিন। (২০ নং)

(ক) সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? নগরায়ণ ও শিল্পায়ন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়?

(খ) সামাজিক পরিবর্তনের সামাজিক উপাদান সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিকীকরণের কোনো সম্পর্ক আছে কী? আপনার মতামত জানান।

একক ২ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ (Theories of Social Change)

গঠন

একক ২.১ সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে মার্ক্সের তত্ত্ব

একক ২.২ সামাজিক পরিবর্তনে ম্যাক্স ওয়েবরের তত্ত্ব

একক ২.৩ থর্নস্টাইন ভেবলেনের সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

একক ২.৪ উপসংহার

একক ২.৫ প্রশ্নাবলী

এর আগের ইউনিট থেকে দেখলাম যে সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে ঘটে। সমাজের পরিবর্তন অধ্যয়নে যে বিষয়গুলির ওপর সমাজতাত্ত্বিকরা বিশেষ জোর দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষের ব্যবহারে বদল, যেমন, রেলের লাইন পাতার পর সেই এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব ও পরিবর্তন, আবার সামাজিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, আবার কখনো সাংস্কৃতিক ধারায় পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তন কেন ঘটে সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন।

এই ইউনিটে আমরা তিনজন তাত্ত্বিকের সামাজিক পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা সম্পর্কে জানব। প্রথমে কার্ল মার্কস, তারপর ম্যাক্স ওয়েবার ও শেষে থর্সস্টাইন ভেবলেন।

একক ২.১ ❑ সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে মার্ক্সের তত্ত্ব (Marx on Social Change)

কার্ল মার্ক্স বলেন সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রেণির (class) সঙ্গে শ্রেণির সম্পর্কে যদি পরিবর্তন আসে তবেই সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আসা সম্ভব। তিনি দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণির ক্রমোচ্চ সজ্জায় একটি শ্রেণির সঙ্গে অপর একটি শ্রেণির সম্পর্কে যখন পরিবর্তন আসে তখন সেই পরিবর্তন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র অতিক্রম করে প্রাতিষ্ঠানিক এমনকি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও ঘটাতে পারে। এই পরিবর্তন মার্ক্সের মতে কখনোই বিবর্তনমুখী পরিবর্তন নয়। এই পরিবর্তন হিংসাশ্রয়ী, রক্তাক্ষয়ী শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ঘটে।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপ জুড়ে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তির যে ব্যবহার মার্ক্স দেখেছিলেন, তাতে তিনি দেখেন কীভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে শহুরে অর্থনীতিক পরিবেশ গড়ে উঠছে।

এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — যাকে পুঁজিবাদ বলে — কীভাবে ইউরোপের সব দেশেই গভীর এক ছায়া ফেলছে তা তাঁর লেখনীর মধ্যে বারবার উঠে আসে। মার্ক্স মানব ইতিহাসে শ্রেণির উপস্থিতি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন। এর আগের সামাজিক ব্যবস্থাগুলিতেও সমাজ বিভক্ত ছিল, বা ক্রমোচ্চ সজ্জায় সজ্জিত ছিল কিন্তু সেই বিভেদের ভিত্তি অর্থনৈতিক হলেও সেই দ্বান্দ্বিক গোষ্ঠীগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেণি চরিত্রের থেকে পৃথক ধরণের ছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে — পুঁজিবাদী শ্রেণি (capitalist class) ছাড়াও অন্য শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণি (working class)। অর্থনৈতিকভাবে উজ্জীবিত থাকার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পুঁজিবাদী শ্রেণি এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য উৎপাদনের উপায় বা পদ্ধতি (means and mode of production) এর মালিকানা ও কর্তৃত্ব কায়েম করে। উৎপাদনের উপায় যেমন কর্মসংস্থানের উৎস তেমনি উৎপাদন চালু রাখার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তিও বোঝায়। পুঁজিবাদী শ্রেণিই নির্ণয় করে উৎপাদন কখন, কোথায় কীভাবে হবে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণী (capitalist class) ছাড়াও অন্য শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী (working class)। তাদের কাছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাছাই বা পছন্দের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। তাদের শ্রম করার ক্ষমতা থাকে, শ্রমকে বিক্রি করতে পারেন বা তাকে ব্যবহার না করতে পারেন। ঊনবিংশ শতকের ইংল্যান্ডে, যেখানে কার্ল মার্ক্সের এই বিষয়ক রচনার মূল রচিত হয়েছে, সেখানে শ্রমিকের পক্ষ থেকে শ্রমদান করা থেকে বিরত থাকার অর্থ হলো দারিদ্রের মধ্যে ডুবে যাওয়া। তার কারণ, সেই সময় সরকারের তরফ থেকে যে শ্রমিকরা কাজ করছেন না, তাদের জন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না।

মার্ক্স দেখিয়েছেন যে সামাজিক পরিবর্তনের একটি কারণ হলো পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তারা যতটা সস্তায় পারেন ততটাই খরচ কমানোর জন্য চেষ্টা চালান দ্রব্যের উৎপাদনও করেন। যাতে, যতটা সম্ভব কম দামে দ্রব্যটি বাজারে ছাড়া যায়। এর ফলে এক আবর্ত তৈরি হয়। যতবার কোনো নতুন আবিষ্কার হয় বা কোনো বিশেষ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় যার কারণে উৎপাদনের মূল্য হ্রাস পেতে পারে, ততই প্রতিযোগী কোম্পানিগুলি সেই আবিষ্কার বা প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেন যাতে উৎপাদনের মূল্য কমানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় দেখা যায় কোন না কোন সময়ে প্রতিযোগী কোম্পানিগুলি একই খরচে বা একই বাজার দরে কোনো দ্রব্য বাজারে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে, মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, আরো বেশি সংখ্যক ক্রেতাকে আকর্ষণ করা জন্য আরো অন্য উপায়ে উৎপাদনের খরচ কমানার ওপর জোর দিচ্ছেন পুঁজিপতিরা। ফলে, আবারও আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা আসে এবং আবর্তটি আবারও চলতে থাকছে। মার্ক্স দেখান উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সব সময় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে তোলা, বিস্তৃত করার প্রচেষ্টাতেও এই কারণে কোনো খামতি থাকে না। এই কারণে কাজকে ক্রমশ ছোট ছোট এককে বিভক্ত করতে শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তাও গড়ে ওঠে। এছাড়াও বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে গণ-উৎপাদনও (mass-production) প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন মার্ক্সের মতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তার কারণ যন্ত্র মানুষের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক বৃহৎ আকারে উৎপাদন করতে পারে। ফলে উৎপাদনের খরচ কমে এবং পুঁজিপতি উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর অনেক বড় অংশে মুনাফাও করতে পারে। তাছাড়া যন্ত্র কখনোই ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, ফলে ধারাবাহিকভাবে, নিরন্তর উৎপাদন করে চলা মানুষের থেকে যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব বেশি।

যেহেতু প্রতিটি দ্রব্য শ্রমিকের শ্রমের মূল্যের থেকে কম মূল্যে উৎপাদিত হয় সেহেতু পুঁজিপতি শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনে বেশি উৎসাহী হন। পুঁজিপতি যত চেষ্টা করেন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ যন্ত্র নির্ভর করে তুলতে, ততই তিনি বেশি মুনাফা করতে পারেন। সুতরাং তিনি চান উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো বেশি যন্ত্রনির্ভর হোক। ঊনবিংশ শতকের পুঁজিপতিরা যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিককে বেশি সময় ধরে শ্রমদানে বাধ্য করতেন। একই পুঁজির বিনিয়োগে, একই খরচায়, তারা চাইতেন শ্রমিকরা বেশিক্ষণ ধরে বেশি সংখ্যক দ্রব্য উৎপাদন করুক। ফলে তারা কম বেতনে, বেশি সংখ্যক দ্রব্য উৎপাদন করবে এমন শ্রমিকের খোঁজে মহিলা ও শিশুদেরও কর্মে নিয়োগ করতেন। ফলে এই সময়ের ইংল্যান্ডে শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়, বিশেষত অপুষ্টি ও নানান রোগের প্রকোপে।

মার্ক্স মনে করতেন এই ধারা অব্যাহত থাকলে তার ফলাফল সামাজিক ক্ষেত্রে কখনোই ভালো হওয়ার নয়। এক, যত বেশি উৎপাদন ব্যবস্থা যন্ত্রনির্ভর হবে, তত কম শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। শ্রমিকরা এর ফলে, কম বেতনে, কম সংখ্যক কর্মসংস্থায় এর সুযোগ পাবেন এবং এই কারণেই এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। দুই, সম্পদ কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত থাকবে এবং এক বিশাল সংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে বেঁচে থাকবেন। তিন, ছোট ছোট ব্যবসাগুলিও ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতায় যন্ত্রনির্ভর হতে না পারায়, উঠে যেতে থাকবে। যেহেতু সম্পদ কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত থাকবে তাই ছোট ছোট ব্যবসায়ী, যারা তাদের ব্যবসা ক্রমে তুলে দিয়েছেন, ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণিতে পর্যবসিত হবেন।

এই কারণেই পুঁজিবাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী বলে মার্ক্স মনে করেন। প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, প্রতিযোগিতা এত ভয়ানক রূপ নিতে পারে যে, তা সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

মার্ক্সের এই ধরণের বিশ্লেষণকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্মিত ও নির্দিষ্ট বলা হয়ে থাকে। মার্ক্স দেখিয়েছেন প্রযুক্তির উন্নতির পর্যায় নির্ণয় করে উৎপাদন পদ্ধতির ধরণকে (mode of production)। এমনকি প্রযুক্তির উন্নতির পর্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সব ধরণের প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের ধরণকেও নির্ণয় করে। অর্থাৎ উৎপাদন করতে এসে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্ক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে নির্ণয় করে। অর্থাৎ সমাজের ভিত্তি হলো অর্থনীতি যার ওপর ভর করে বিশেষ রূপের সামাজিক চেতনা গড়ে ওঠে। মানুষের বা ব্যক্তির সাংস্কৃতিক জীবন; তার বুদ্ধিমত্তা, রুচিবোধ এমনকি অতিজাগতিক অভিপ্রায় ও অপার্থিব জীবনও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। ব্যক্তিই হয়ে ওঠেন সেই 'বস্তু' বা বাস্তব সত্য যা ভাবনার মাধ্যমে চেতনায় প্রবেশ করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিই ব্যক্তির জীবন দর্শন, তার সামাজিক মর্যাদা, তার চিন্তা চেতনাকে নির্ণয় বা প্রভাবিত করে।

মার্ক্সীয় সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বকে যদি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে বলতে হয় যে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তব শক্তির পরিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। এখানেই সমাজের ভিত্তি হিসাবে গঠিত অর্থনৈতিক উপাদানের সঙ্গে তার ওপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ঘটে। সমকালীন উৎপাদন

প্রক্রিয়া পরিবর্তন নিয়ে আসতে চায় (মালিক শ্রেণি) যার ফলে অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন আসে কিন্তু অর্থনৈতিক এই চাহিদার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো একইভাবে ক্রিয়াশীল থাকে না। তার কারণ পুরাতন সামাজিক কাঠামো তার নিজস্ব ভাবাদর্শ ও কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করেছে। যারা এই ভাবাদর্শ ও কায়েমী স্বার্থের ভারে এতদিন ন্যুব্জ ছিলেন তাদের চেতনার ফলে তারা এই কাঠামোর সম্পূর্ণ বিলোপ দাবি করেন (শ্রমিক শ্রেণি)। ফলে, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজ পরিবর্তিত হয়।

পুঁজিবাদী সমাজে যেমন বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন আসে ঠিক তেমনি এর পূর্ববর্তী সামাজিক পর্যায়গুলিকে, যেমন, দাস সমাজ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই পরিবর্তন আসে। সামাজিক পর্যায়গুলি ভিন্ন কিন্তু তাদের বিবর্তনের ইতিহাস একই। প্রতিটি পর্যায়েই সমাজ দুটি এবং কেবল দুটি শ্রেণিতেই বিভক্ত হয়ে, যুযুধান পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, দ্বান্দ্বিক নিয়মে, বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। তবে কী ভাবে বিগত পর্যায়ে এই যুযুধান পরিস্থিতি গড়ে ওঠে, তার সময় কত লাগে এ বিষয়গুলির বিচার করলে পুঁজিবাদী সমাজ সবচেয়ে চরম একটি পর্যায় বলে মার্ক্স চিহ্নিত করেন। পুঁজিবাদী সমাজে দুটি শ্রেণির দ্বন্দ্ব সরলীকৃত এবং কেবলমাত্র দুটি শ্রেণি, বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়ত, এক্ষেত্রে যুযুধান দুই পক্ষ।

এবার প্রশ্ন হলো, এই বিপ্লব ঘটে কি করে? এই প্রসঙ্গে আলোচনা আগেই করা হয়েছে যে পুঁজিবাদের নীতিই হল মুনাফা অর্জন করা। শ্রম ক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজিপতি এই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করেন। শ্রমিক এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে শ্রম দান করেন, তা তার ক্রয়মূল্যের থেকে অনেক বেশি। এইভাবে শ্রমিক যত বেশি সময় ধরে কাজ করবেন ততই তিনি তার শ্রমের মাধ্যমে কম ক্রয়মূল্য (যা তার মজুরি) বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) সৃষ্টি করবেন। এই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির ফলে পুঁজিপতি তার মুনাফার সঙ্গে একযোগে এই মূল্যটিও তার কুক্ষিগত করেন যার ফলে ধনী আরো ধনী হন এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হতে থাকেন। কিন্তু ধনী আরো ধনী হলেও তাদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং অপরদিকে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে এমন পরিস্থিতি আসে যেখানে শ্রমিকের পক্ষে এই দমনমূলক ও শোষণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয় না, ফলে সে চায় এই সম্পর্ককে পরিবর্তন করতে। কিন্তু পুঁজিপতির কাছে এই সম্পর্ক বজায় রাখলে সুবিধাজনক বলে সে চায় না এই সম্পর্কের বদল হোক। ফলে, দ্বন্দ্ব লাগে এবং শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী এক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের ধ্বংস হয় ও এর ওপর গড়ে ওঠে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

মার্ক্স যে সামাজিক বিবর্তনের ছবি এঁকেছেন এবং যেভাবে তাতে বিপ্লবের মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছেন, সেই তত্ত্বের কতগুলি শক্তিশালী দিক ও কতগুলি দুর্বল দিক আছে। এর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো, যে সব সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের কাছে এই তত্ত্ব রোমহর্ষক, আমূল সংস্কারবাদী, মুক্তিদায়ী এক দর্শন। দুই, তিনি পুঁজিবাদী সমাজের জটিল প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিকে খুব সহজভাবে উপস্থাপিত করেছেন। কোনো একটি অর্থনৈতিক শ্রেণির তাদের পরিবার, পেশা, জাতির প্রতি আনুগত্য ও ঐক্যের বোধ ও চেতনাকে খুব সাধারণভাবে এড়িয়ে গিয়ে পুঁজিবাদী সমাজে দুই শ্রেণির দ্বন্দ্বের ছবি আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। তার তত্ত্বের দুর্বলতর দিকগুলির মধ্যে একটি হলো তিনি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের

সম্পর্ক কিভাবে সমগ্র সমাজকে আন্দোলিত ও পরিবর্তিত করে তা দেখিয়েছেন কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থ আমাদের জীবনে কি আর অন্য সব ধরণের স্বার্থের ভিত্তি হতে পারে? এই প্রশ্ন থেকেই যায়। দুই, ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা উপস্থিত করতে গিযে মার্ক্স যেভাবে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন ও যেভাবে বলেছেন যে পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকবে না, সে কথা সম্পূর্ণ সফল হতে পারে এমন কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। অন্তত বাস্তব পরিস্থিতি সেই ইঙ্গিত দেয় না, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে তা আজ আংশিক ভাবে প্রমাণিত।

একক ২.২ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের ম্যাক্স ওয়েবরের তত্ত্ব (Max Weber on Social Change)

সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতি যে গুরুত্বপূর্ণ একটি চালিকাশক্তি তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতি যে একটি উৎস হিসাবে সরাসরি কার্যকর হয় তা ছাড়াও সংস্কৃতির প্রভাবের উপযোগিতাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গে যে সমাজতাত্ত্বিকরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ম্যাক্স ওয়েবর। তার বিখ্যাত ধারণা যে বিশেষ ধরণের প্রটেস্টন্টবাদ পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায়ের উত্থানে কীভাবে উদ্দীপকের কাজ করেছে তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন কোনো সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক নীতির সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সরাসরি সম্পর্ক থাকে। কিন্তু তিনি কখনোই স্বীকার করেননি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক নীতির সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সরাসরি সম্পর্ক থাকে। কিন্তু তিনি কখনোই স্বীকার করেননি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক নীতিকে নির্দেশ করে। ওয়েবর দেখিয়েছেন দুটিই একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং কোনো কোনো সময়ে সাংস্কৃতিক উপাদান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথ সুগম করে। তিনি এই বক্তব্যে পৌঁছনোর জন্য দেখালেন যে ব্যবহারিক নীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক আছে কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া অন্য উপাদানও ব্যবহারিক জীবনের নীতি নির্ধারণ করতে পারে। প্রতিটি সময়ের প্রেক্ষিতে, প্রতিটি গোষ্ঠীর কিছু বিশেষ বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থাকে যা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় ও অর্থনীতিক ঘটনার ঐতিহাসিকতার সংগতি বা সাযুজ্য এই একই ধারার যুক্তির সাহায্যে ওয়েবর দেখিয়েছেন। বিশেষ ধরণের ধর্মীয় বিশ্বাসের ঐতিহাসিকতাকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান এক বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ভূমিকা নিয়েছিল অর্থাৎ পুঁজিবাদের (অর্থনৈতিক ব্যবস্থার) পথ সুগম করে তুলেছিল পার্থিব, জাগতিক জীবন সম্বন্ধীয় বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস (প্রটেস্টান্টিজম)।

তিনি দেখান ধর্মপ্রাণ বুর্জোয়র কাছে তার ব্যবসাই ঈশ্বর প্রদত্ত কর্ম। সেকারণে কাজের প্রতি নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও ভক্তির সাহায্যে তিনি তার ব্যবসায় মিতব্যয়িতা, সঞ্চয়, পার্থিব সন্ন্যাসজীবন গড়ে তোলেন যা পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায়ের উত্থানের পর্যাপ্ত উন্নতিসাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি মনে করেন বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই প্রাক্-পুঁজিবাদী বা প্রারম্ভিক পুঁজিবাদী পর্যায় ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মিতস্ক্রিয়া ঘটে। এই

পরিস্থিতিতে এত ধরণের উপাদান উপস্থিত থাকে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের এমন জটিল জাল গড়ে ওঠে যে স্পষ্টভাবে বাছাই করা উপাদনগুলির মধ্যেকার সম্পর্ককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না, বিশেষত অন্য ঐতিহাসিক সময়ের প্রেক্ষিতে।

একক ২.৩ ❑ থর্নস্টাইন ভেবলেনের সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Social Change by Thornstein Veblen)

কার্ল মার্ক্সকে যদি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ পরিবর্তনকে নির্ণয় করার জন্য বিবেচনা করা যায় তাহলে থর্নস্টাইন ভেবলেন হলেন এমন এক তাত্ত্বিক যিনি প্রযুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ পরিবর্তনের কারণকে নির্ণয় করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানুষের জীবন, তার কি ধরণের কাজ এবং সেই কাজে তিনি কোন ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন তার ওপর নির্ভর করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তাদের চিন্তা-চেতনা, তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি সবই মানুষের কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ধরণের ওপর নির্ভরশীল। তার কারণ হিসাবে ভেবলেন দেখিয়েছেন প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে একই কাজ একইভাবে করতে অভ্যস্ত করায়। সুতরাং তার মত হল যে অভ্যাস মানুষকে ও তার চিন্তা-চেতনা-মনকে এবং তার শরীরকে একই ধাঁচে বেঁধে রাখে। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে মানুষের কিছু ইচ্ছা (drives) আছে এবং কিছু সহজাত সংস্কার (instinct) আছে যেগুলি ধ্রুবক (constant) হিসাবে কার্যকর থাকে। বাস্তব পরিবেশের বিভিন্ন সুযোগ ও ভাবপ্রকাশ অভ্যাস অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। সুতরাং, পরিবেশের পার্থক্য সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতিগত পার্থক্যকে নির্ণয় করে। তবে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ক্রিয়ারত থাকতে, কিছু পাওয়ার লক্ষ্যে স্থিরীকৃত অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটায়। অর্থাৎ, যে বাস্তব পরিস্থিতিতে মানুষ বাঁচে, সেই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের জীবন-প্রক্রিয়া কতগুলি অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান নির্ভর হয়ে থাকে। যে কোনো সম্প্রদায়কে শিল্প-নির্ভর বলা যায় তখনই যখন সেই সমাজের কাঠামো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রদায়ের জীবন প্রক্রিয়াকে কতগুলি অভ্যাসের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে। একইভাবে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর উদাহরণ টেনে তিনি দেখান এটি এমনই একটি ব্যবস্থা যেখানে মানুষ মানুষকে অবদমিত করে রাখতে চায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বংশানুক্রমিকভাবে গঠিত এবং ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের পর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবস্থায় শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির কর্তৃত্ব কায়েমের ও অনুবর্তীতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধর্মও এক্ষেত্রে কর্তৃত্বকারী রাজধর্মতন্ত্রী ও ক্রমোচ্চভাবে সজ্জিত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমাজের প্রযুক্তির ব্যবহারে বদল আসে অর্থাৎ মানুষের ক্ষমতাকে ব্যবহার করার পরিবর্তে যন্ত্রের দ্বারা ক্ষমতা ব্যবহার করার অভ্যাস শুরু হয়। নতুন দক্ষতার শিক্ষা ধীরে ধীরে অতীতের দক্ষতার মাপকাঠিকে অতিক্রম করে। অভ্যাসবশতঃ যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদন হতে শুরু করলে, ক্ষমতা সম্বন্ধীয় ধারণাতেও বদল আসে। এই পরিবর্তন ঘটলে, ব্যক্তিগত স্তরে ক্ষমতা কায়েম করার প্রবণতাতেও বদল আসে। ফলে, এক নতুন ভাবনা, নতুন যুক্তি গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগে। নতুন প্রযুক্তি, সামাজিক প্রয়োজনে, পুরনো সমাজের সব সংগঠনকে ধ্বংস করে। যে প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পের প্রভাবে ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

ভেব্‌লেন তার লেখা গ্রন্থ, "Imperial Germany and the Industrial Revolution'-এ দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক শাসক শ্রেণির সঙ্গে ঐ দেশের শিল্পায়নের শক্তিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব কীভাবে পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার রীতিনীতি বা লোকনীতির সঙ্গে প্রযুক্তিগত বা যান্ত্রিক অগ্রগতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ঘটে। প্রাথমিকভাবে শাসক শ্রেণি এই দ্বন্দ্বের মুখে পড়ে না তার কারণ প্রথমদিকে ঐ শ্রেণির অগ্রগতির জন্য যান্ত্রিক বা প্রযুক্তির প্রয়োজন থাকে। যখন দ্বন্দ্ব লাগে তখন শাসকশ্রেণির অগভীরতা স্পষ্ট হয় এবং তা প্রকাশিত হয়।

সুতরাং ভেব্‌লেনের মতে প্রতিটি সামাজিক পর্যায়ের বিশেষ অভ্যাসগুলি ঐ সময়ের প্রযুক্তির নির্দিষ্ট জীবন-চক্রের ওপর নির্ভরশীল। যত বেশি কোনো সমাজ গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে ততই প্রযুক্তি শক্তিশালী হবে। তিনি দেখান যে কোনো জাতিনির্ভর সমাজে প্রযুক্তির প্রভাব ও তাৎপর্য উচ্চ জাতিগুলির ক্ষেত্রে যে রকম, নিম্নতর জাতিগুলির ক্ষেত্রে তা আলাদা। সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ শ্রেণির সঙ্গে সংযুক্ত এবং সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা একইভাবে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির ক্ষেত্রে একই এমন নয়। উচ্চ শ্রেণিভুক্ত মানুষ যে মাননির্ভর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে অভ্যস্ত, নিম্নতর শ্রেণিভুক্ত মানুষ একই মাপকাঠির নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করেন না। ফলে উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য গড়ে ওঠে। উচ্চ শ্রেণির মানুষ সেই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন যেগুলিতে সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বেশি, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ কায়েম সম্ভব। নিম্নতর শ্রেণিভুক্ত মানুষ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সঙ্গে অভ্যস্ত। কিন্তু এরা যে ধরণের নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে নিজেদের জীবনকে অভ্যস্ত করে তোলে, সেগুলি কোনভাবেই উচ্চতর শ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং, একই সমাজে দু'ধরণের সংস্কৃতি পাওয়া যায়। শিল্প-গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় প্রযুক্তির প্রভাব বেশি ও সর্বব্যাপী হওয়ার ফলে সব ধরণের ব্যবহারই এক কাজের সাধারণীকরণের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। প্রত্যেকেই অলঙ্ঘনীয় আইনের, মাননির্ধারী ধারার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করেন।

ভেব্‌লেন দেখিয়েছেন, পশুপালক, কৃষি, শিল্পক্ষেত্রেও এগুলির যে কোনো একটিতে প্রতিদিনের জীবনের অভ্যাস তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অভ্যাসগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গৃহীত হয় এবং এই প্রাতিষ্ঠানিক জালই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। তবে জীবনে কি ঘটবে এবং জীবন কেমন বা সেক্ষেত্রে কি ঘটছে, তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে, পরিবর্তনের সময়ে বিশেষ করে, মানুষ এক রকম চিন্তা চেতনার আঙ্গিকে কাজ করছেন কিন্তু ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে পুরনোপন্থী। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলেই বিবর্তনমুখী প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে শিল্প অভ্যাস থেকে আরো সূক্ষ্মতর অভ্যাসের দিকে। অর্থাৎ ভেব্‌লেনের মতে সামাজিক বিবর্তন হল সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

ভেব্‌লেনের সঙ্গে মার্ক্সের তুলনা করলে দেখব যে মার্ক্স তার সমাজতন্ত্রের ভাবনায় যতই বৈজ্ঞানিকতার কথা বলুন না কেন, তার নৈতিক আবেগ ও ভাবনা কখনোই লুকোতে পারেননি (ম্যাকাইভার ও পেজ, ২০০৯ : ৫...) ভেব্‌লেন অন্যদিকে এমনভাবে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন যার মধ্যে কোনো নাটকীয়তা

নেই। ভেব্‌লেন খুব সাধারণভাবেই বলছেন যে প্রযুক্তিগত ভিত্তি ক্রমশ দক্ষতর ও জটিলতর হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে।

ভেব্‌লেন পড়ার প্রয়োজনীয়তা এখানেই যে তিনি সামাজিক বিবর্তনের অধ্যয়নে পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে মৌলিক শিল্পকর্মের গভীর সম্পর্কের কথা বলেছেন। কিন্তু তার ব্যাখ্যা কি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য? তার কারণ পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে অভ্যাসের পরিবর্তন কি সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হতে পারে? প্রশ্ন থেকে যায়, কারণ যে গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে, সেই গোষ্ঠীরও আভ্যন্তরীণ কাঠামোর এমন কোনো উপাদান থাকতে পারে যা ঐ পরিবর্তনশীলতার প্রতি উদ্দীপকের কাজ করে। তাছাড়া একটি সমাজ পরিবর্তনের কথা যখন ওঠে তখন পরিবেশ, বাস্তব, সামাজিক দুই-ই, সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, ব্যথা, আনন্দ, সুযোগ, বাধার সীমাহীন বৈচিত্র্য কার্যকর হয়, সেক্ষেত্রে অভ্যাসের বদলে সামাজিক পরিবর্তন খুবই সাধারণ সরল ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায়।

একক ২.৪. ❑ উপসংহার (Conclusion)

সামাজিক পরিবর্তনের তিনটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান — অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক — সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিকদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল। অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন কার্ল মার্ক্স, প্রযুক্তিগত উপাদানের গুরুত্ব বিশ্লেষণে ভেব্‌লেন ও সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, ম্যাক্স ওয়েবর। এই তিন তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ বিশেষ উপাদানগুলির তাৎপর্য কতটা তা আলোচিত হলো।

একক ২.৫ ❑ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (৬ নং)

(ক) উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি?

(খ) প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম নীতি কি?

(গ) যন্ত্রের ব্যবহার কিভাবে ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত?

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন। (১২ নং)

(ক) মার্ক্সের সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সম্বন্ধে লিখুন।

(খ) মার্ক্স ও ভেবলেনের সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(গ) ওয়েবর কীভাবে ধর্মীয় নীতি ও পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছেন, তা লিখুন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিন। (২০ নং)

(ক) মার্ক্সের সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা কিভাবে বিপ্লবের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত তা আলোচনা করুন।

(খ) প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কিভাবে সম্পর্কিত তা ভেব্‌লেনের ধারণা অনুসরণ করে দেখান।

(গ) সামাজিক পরিবর্তন কি শুধুমাত্রই বৈপ্লবিক পরিবর্তন? আপনার মতামতের সমর্থনে একটি তত্ত্বের বিশ্লেষণ করুন।

একক ৩ ❑ সামাজিক বিবর্তন, সামাজিক প্রগতি ও সামাজিক উন্নয়ন (Social Evolution, Social Progress and Social Development)

গঠন

একক ৩.১ সামাজিক বিবর্তন - অর্থ ও সংজ্ঞা

একক ৩.২ সামাজিক প্রগতি

একক ৩.৩ সামাজিক উন্নয়ন

৩.৩.১ সংরক্ষণশীল উন্নয়ন

একক ৩.৪ উপসংহার

একক ৩.৫ প্রশ্নাবলী

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ার রদবদলকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। সামাজিক পরিবর্তন প্রগতিশীল বা প্রত্যাবর্তী দুই প্রকারেরই হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত বা শ্লথগামী বির্বতনবাদী বা আমূল সংস্কারবাদীও হতে পারে। সব সমাজই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে পরিসংখ্যাগত বা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, সামাজিক পরিবর্তন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার একটি অংশ। একারণে সামাজিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক ও ধারাবাহিক বলা হয়। সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার সঙ্গে যুক্ত দুটি ধারণা — সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক প্রগতি—আলোচনার পর সামাজিক পরিবর্তনের ফলাফলে সামাজিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে।

একক ৩.১ ❑ সামাজিক বিবর্তন - অর্থ ও সংজ্ঞা (Social Evolution-Money and Definition)

মানব সংস্কৃতির প্রগতিশীল ও ক্রমবর্ধিষ্ণু বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে নৃত্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক পরিবর্তনকে 'পর্যায়ক্রমিক' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই পর্যায়গুলি হলো বর্বর (savage), অসভ্য (barbarous), সভ্যতা (civilization)। কোনো কোনো তাত্ত্বিক বিবর্তনকে একরৈখিক (unilinear) প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন। তারা মনে করেন একই ধরণের পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সব সমাজই এগোয়। আবার কেউ কেউ মনে করনে, সমাজ হলো বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন যা ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।

একরৈখিক তাত্ত্বিকরা মনে করেন সমাজ ও সংস্কৃতি প্রগতির পথ ধরে ক্রমবর্ধিষ্ণু বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে, ধাপে ধাপে নির্ভুল একটি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে। কোঁত এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা,

তিনি মনে করেন প্রত্যেক সমাজ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্প সমাজে উপনীত হবে, যেখানে জীবনের সব দিকেরই প্রগতি ঘটবে। লুই হেন্‌রি মর্গ্যান সমাজের একরৈখিক উন্নয়নের ছবি এঁকেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমাজ বর্বরতাকে অতিক্রম করে অসভ্য পর্যায় থেকে সভ্যতার শিখরে পৌঁছয়। বিশ্বজনীন বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেন্সর সমাজকে সরল থেকে যৌগিক সমাজে উন্নীত হওয়ার পর্যায়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। স্পেন্সর দেখিয়েছেন ক্রমাগত পৃথকীকরণের (differentiation) মাধ্যমে সমাজের অংশগুলি যেমন বিভক্ত হয়ে পড়ে তেমনি আবার কাঠামোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে, ক্রমশ সমাজের আকার বড় হয়। এই তত্ত্ব স্থিরীকৃত পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের ক্রমবর্ধমানতাকে বিশ্লেষণ করে না। বরং সমাজ সামগ্রিভাবে বিবর্তনের আপাত পথ ধরে এক এক সংস্কৃতিতে এক এক রকম পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ধারায় বাহিত হয়। আবর্তনবাদী বিবর্তনের তত্ত্বে আপাত কোনো পর্যায়ের কথা বলা হয় না। ওস্‌ওয়াল্ড স্পেঙ্গালার এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা। ঐতিহাসিক সব সময়ের তত্ত্বকে বাতিল করে স্পেঙ্গালার বলেন যে, কোনো রেখাকার সময় নয় বরং ইতিহাস খুঁজলে বহু ঐতিহাসিক সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে। অতএব, স্পেঙ্গালারের মতে, সমাজের জীবদেহের মত, জন্ম, কৈশোর, যৌবন, পরিপক্কতা, পতন এবং ক্ষয় আছে। সমাজের উত্থানের পর্যায়টি হলো সংস্কৃতি এবং পতনের সময় বা পর্যায়টি হল সভ্যতা। এই তত্ত্বের অন্যতম আরেক প্রবক্তা হলেন আর্নাল্ড টয়েনবি। তিনি দেখিয়েছেন সমাজের ইতিহাসের ধারা সামগ্রিকভাবে বৃত্তাকার, প্রত্যেকটি দীর্ঘ, যেখানে স্থায়ী সংস্কৃতি উচ্চতায় ওঠে, প্রতি পর্যায়ে আগের তুলনায় উন্নত পরিস্থিতি ও পর্যায়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। এই তত্ত্বের আরো একজন প্রবক্তা পিট্রিম সরোকিন মনে করেন ইতিহাসের ধারা ধারাবাহিক কিন্তু অনিয়মিত অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে সংবেদনশীল (sensitive) সংস্কৃতি থেকে ভাবনাজ (ideational) সংস্কৃতিতে উন্নীত হয়। সংবেদনশীল সংস্কৃতি মানুষের আবেগের ওপর ভিত্তি করে, পর্যবেক্ষণযোগ্যতার মধ্যে সীমিত সংস্কৃতিকে বোঝায়। অন্যদিকে ভাবনাজ সংস্কৃতি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ওপর বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠে। এছাড়াও আছে ভাবাদর্শগত সংস্কৃতি (idealistic culture) যা সংবেদনশীল ও ভাবনাজ সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে ওঠে। প্রতিটি সমাজের স্বর্ণযুগে ভাবনাজ সংস্কৃতি দেখা যায় এবং সভ্যতা যখন ধ্বংসের পথে পা বাড়ায় তখন নৈতিক মূল্যবোধহীনতা লোভকে চরিতার্থ করার ইচ্ছা, কামুক চাহিদা এবং সংবেদনশীল সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

সমকালীন সময়ের বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকরা বিবর্তনের এই বৃহৎ তত্ত্ব (grand theory) বাতিল করে কোনো বিশেষ সমাজের পরিবর্তনের রূপ ও ফলাফল বিচারে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। পার্সন্স, উইলবার্ট ম্যুর প্রমুখ বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকরা আধুনিকতার তাত্ত্বিক কাঠামোকে ব্যবহার করে বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বিবৃত করেছেন। তারা দেখিয়েছেন আধুনিকীকরণ সনাতনী সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার অগ্রসর, অর্থনৈতিকভাবে সফল, আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিকভাবে স্থির রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

বস্তুত, সমাজ যে বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে বিবর্তনের এই প্রক্রিয়া পরিবর্তিত পথ ধরে আবার প্রাচীনতায় ফিরবে না। বিবর্তনবিমুখ শক্তি সব সময়ই বিবর্তনের পথকে বাধা দেয়। যেমন নাৎসি জার্মানিতে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কে চার্চের স্বাধীন সত্ত্বার বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিবর্তনের পথে চলতে গিয়ে সব সময় প্রগতিই লক্ষ্য হয় এমন নয়।

একক ৩.২ ❑ সামাজিক প্রগতি (Social Progress)

প্রাচীন থেকে আধুনিকতার দিকে যাত্রা সব সময়ই প্রগতিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত হয়েছে। এছাড়া, এমন অনেক পরিস্থিতি ঘটে, যেখানে মানবীয় মূল্যবোধের ওপর আমাদের ব্যাখ্যা নির্ভর করে যেখানে বিবর্তনবাদী পরিবর্তন আদতে প্রগতিশীল কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, সব বিবর্তনবাদী পরিবর্তনই প্রগতিশীল হবে এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। অগাস্ট কোঁত অবশ্য সেভাবে সমাজের পরিবর্তনকে অভিহিত করেননি। তিনি দেখিয়েছেন পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে প্রগতির পথে হাঁটতে থাকে। হার্বার্ট স্পেন্সর, কোঁতের মত অনুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন সব সময়ই প্রগতিশীল এমন কথা নেই।

বিশ্ব জুড়ে সমাজে যেভাবে পরিবর্তন ঘটেছে সেই প্রক্রিয়াকে বিচার করলে আমরা দেখব শিকারী সমাজ থেকে কৃষি সমাজে উত্তরণ প্রগতিশীল ছিল। আবার সমাজের প্রকৃতিই শুধু নয় প্রতিষ্ঠানের সহজ সরল প্রকাশ থেকে ক্রমশ জটিল ও যৌগিক প্রকাশ প্রগতিশীলতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক বেঁধেছে।

বিবর্তনের সঙ্গে প্রগতিশীলতার ধারণাকে একত্রিত করে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা তাত্ত্বিকদের মধ্যে বেশ পুরনো। অষ্টাদশ শতকে আলোকবর্তিকার যুগে প্রগতি বলতে বোঝাত ঐতিহ্যবাহিতা ও ক্ষমতার স্বৈরাচারী শক্তি প্রকাশের থেকে মুক্তি। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে প্রগতি বলতে বোঝাত সমাজের বিজয়ী বিস্তৃতি ও পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্ভারের ব্যবহার। অর্থাৎ পরিস্থিতি ও পরিবেশের তারতম্যে প্রগতির ধারণা বদলাতে থাকে। সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রগতি কাকে বলা যায় এবং কী কারণে ঘটে সে বিষয়ে মতান্তর আছে। যেমন, এক দল মনে করেন প্রগতি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের জন্য অর্থনৈতিক মাপকাঠিই যথেষ্ট। এদের মতে অর্থনৈতিক প্রগতির অর্থ হলো প্রগতির পথে অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি। অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির পরিমাপ করা যায় কিন্তু যা পরিমাপ করা সহজ নয় তা হলো প্রগতি। এরা অর্থনীতিবিদদের বিপরীতে প্রগতি বলতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি নয় বরং বলতে চান সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে প্রগতি সমগ্রের অংশ নয় বরং একটি বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে অর্থনৈতিক কল্যানসাধ্য ঘটেছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রগতির নৈতিক মূল্যের প্রশ্ন বেশি গুরুত্ব পায়।

এবার প্রশ্ন হলো, প্রগতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যে সুবিধা, পরিষেবা, যান্ত্রিক, মাননির্ধারী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আসে তার কি মূল্য মানুষকে দিতে হয়? যেমন, প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি, যুক্ত সম্পর্কে ছেদ পড়ে। এই একদিকে পাওয়ার পাশাপাশি অন্যদিকে কিছু ছাড়ের আমরা কিভাবে ভারসাম্য রাখতে পারি সেটা আলোচ্য বিষয় এবং এই ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেই প্রগতির প্রকৃত অর্থ সঠিকভাবে চরিতার্থ হতে পারে। যেমন, আমাদের এই সভ্যতায় ক্রমশ বস্তুগত জিনিস বা দ্রব্যের বৃদ্ধি ঘটছে। এই বৃদ্ধি অনেক সময়ই যান্ত্রিক, মাননির্ধারী ও নিয়মমাফিক। শহর সভ্যতার এই উন্নতিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ধীরে ধীরে গভীরতা হারাচ্ছে। কিন্তু প্রগতি কতটা হয়েছে সেই হিসাব করতে গেলে এই দুটি দিকই দেখা দরকার। অর্থাৎ দুটি চরম পথকে একই সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বরং দুটির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করাই প্রধান কাজ। সেখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সামগ্রিক ঘটনার পরিবর্তনে কোন্‌টিকে গুরুত্ব দেব, এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। আমাদের, সাধারণ

মানুষের হাতে সব কিছু থাকে না যা তারা নিজেদের মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন মানুষের আবিষ্কারের নেশা কেন আছে? এই প্রশ্নের সঠিক, একটি উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একদিকে মনে হতে পারে যে মানুষ অনুসন্ধানের নেশায় এই খোঁজ চালায়, কখনো মনে হতে পারে যে শুধুমাত্র নামের জন্য, যশের লোভে মানুষ ছুটে বেড়ায় অজানাকে জানার জন্য। আবার কখনো মনে হয় অর্থের জন্য, মুনাফার জন্য মানুষ অনুসন্ধান চালায়। সুতরাং আমরা যা কিছু চাইছি বা চাই, সবই যে কোনো বিশেষ ধারার মধ্যেই সীমিত থাকবে এমনও নয়।

সুতরাং প্রগতি হচ্ছে, তা কিভাবে পরিমাপ করা যায়, কোন্‌টিকে প্রগতি বলব আর কোন্‌টি প্রগতি হতে পারে না এ নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকে।

সমাজতত্ত্বে প্রগতির ধারণা যখন ব্যবহৃত হয়, তখন আমরা তার দুটি ভিন্ন ধারা লক্ষ্য করব। এক হার্বার্ট স্পেন্সর, অগাস্ত কোঁত, টি. বি. বটোমোর প্রমুখ মনে করেন সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক প্রগতি সমার্থক। যেমন, স্পেন্সর দেখান যে সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক প্রগতি মূলতঃ এক ও অভিন্ন কারণ সামাজিক প্রগতি সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই কাজ করে। কিন্তু এই ধারণা সর্বাংশে গৃহীত নয়। যেমন, দ্বিতীয় ধারাটিতে বলা হয় সামাজিক পরিবর্তনমাত্রেই সামাজিক প্রগতি নয়। সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় বাস্তবে সংঘটিত ঘটনার পরম্পরা। সামাজিক প্রগতির মধ্যে নিহিত থাকে নৈতিক লক্ষ্য ও মূল্যবোধের ধারণা। এস. টি. হবহাউজ বলেছেন যে সামাজিক পরিবর্তনের অনেকগুলি সম্ভাবনাময় ফলাফলের মধ্যে একটি হলো সামাজিক প্রগতি। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক প্রগতির সম্পর্ক আছে এ কথা অনস্বীকার্য কিন্তু দুটি বিষয় অভিন্ন নয় বা উভয়ই এক এ'কথা বলা যায় না। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি একটি বিশেষ ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেই গণ্য করা হয়।

একক ৩.৩ ❑ সামাজিক উন্নয়ন (Social Development)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়ন বলতে বোঝাত আধুনিক হয়ে ওঠা। বেশিরভাগ সমাজতাত্ত্বিকই মনে করতেন আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন ও প্রকারান্তরে যা সামাজিক পরিবর্তন। আধুনিকীকরণ হলো সেই প্রক্রিয়া যা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে জটিল পরিবর্তনের তরঙ্গ শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে চলে। আধুনিকীকরণ হলো সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য এমনকি ধর্মের মধ্যে এক ধারাবাহিক চলমান পরিবর্তন। কখনো এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগে পরিবর্তনের ঢেউ ওঠে কিন্তু কোনো কোনো ভাবে সমাজের সব ক্ষেত্রকে সেই পরিবর্তন ছুঁয়ে যায়।

আধুনিকীকরণ প্রথম শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসন ভেঙে পড়তে শুরু করার সময় থেকেই। পূর্বতন উপনিবেশগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের মধ্যে নতুন স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি)। এই নতুন দেশগুলি তাদের উন্নয়নের স্বার্থে ঐতিহ্যবাহী, সনাতনী ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অর্থনীতি সব কিছুতে পরিবর্তন আনার জন্য 'আধুনিক' হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে একটি ধারণা এদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলো, প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী

সনাতনী সমাজ, আধুনিক, উন্নত সমাজের তুলনায় সব দিক থেকেই পিছিয়ে পড়েছে। যেমন ড্যানিয়েল লার্নার (১৯৬৮) বলেন, আধুনিকীকরণ হলো সমাজ পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উন্নয়নশীল সমাজগুলি উন্নত সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করে। আধুনিকীকরণ কি? তা বুঝতে হলে এমন কিছু সাধারণ পরিবর্তনের কথাও ভাবতে হয় যা সমগ্র সমাজকে কোনো কোনো ভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনগুলি অনেক এক একত্রে একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রত্যেক পরিবর্তনের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের পরিবর্তন যুক্ত। এক এক দেশে প্রক্রিয়াটির কার্য প্রক্রিয়া আলাদা হয় সেই দেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।

আধুনিকীকরণের ফলে সাধারণ, সরল, ঐতিহ্যবাহী কৌশল ছেড়ে বিজ্ঞাননির্ভর কোন সমৃদ্ধ প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়। কৃষি ক্ষেত্রে অর্থনীতি থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাণিজ্যনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শিল্পক্ষেত্রে মানবনির্ভর শক্তির ব্যবহারের পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর শিল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গ্রামীণ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সমাজ কাঠামো ক্রমশ আধুনিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে, অনেক সময় শক্তিশালী অ-ধর্মীয় ভাবাদর্শ যেমন জাতীয়তাবাদী ধারণার জন্ম হয়, পরিবার আর অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার একক হিসাবে গণ্য হয় না, বর্ধিত পরিবার ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে একক পরিবারের সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। আধুনিক সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা ক্রমশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সামাজিক কাঠামোয় আমলাতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থারও প্রচলন হয়। এই সামাজিক পরিবর্তনগুলির পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও দেখা যায়। যেমন, ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের পরিবর্তে আধুনিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা, অন্য সম্প্রদায় বা নৃকুল গোষ্ঠীজীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও সহমর্মিতা ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের রীতির সমালোচনা করে নির্ভরশীলতার তত্ত্ব (Dependency theory) উন্নয়নকামী সমাজের অন্য এক ছবি এঁকেছেন। আঁন্দ্রে গুন্ডের ফ্র্যাঙ্ক ১৯৬৬ সালে এই তত্ত্বের প্রারম্ভিক সূত্রগুলির সূচনা করেন। ফ্র্যাঙ্ক দেখান এই বিশ্ব ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ নাগরিক কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির থেকে পুঁজি ও অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত এবং কাঁচামাল লুণ্ঠন করে এবং এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির আঞ্চলিক স্তরে কোনো ধরণের শিল্প গড়ে তোলার বিপক্ষে থাকে। ফলে আঞ্চলিক স্তরে বাণিজ্য ও শিল্প যাই গড়ে ওঠে তা ঐ নাগরিক কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণেই সংগঠিত হয়। ফলে, উন্নয়নশীল দেশ, উন্নয়নের নামে ক্রমশ সম্পদে, পুঁজির দিক থেকে নিঃশেষিত হতে থাকে। এই কারণে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের মডেল যদি আধুনিক নগরকেন্দ্রিক দেশগুলি হয় তাহলে উন্নয়নের মাধ্যমে প্রগতির বিপরীতে নির্ভরশীলতা ও অনুন্নতিই ঘটে।

আধুনিকীকরণ তত্ত্বের আরো একটি সমালোচনার ধারণা গড়ে তোলেন ইম্যানুয়েল ওয়ালেরস্টাইন। তিনি দেখান, বিশ্ব অর্থনীতি বস্তুত ঐক্যবদ্ধকারী একটি ব্যবস্থা যেখানে বিনিময় সব সময়ই অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। কিন্তু আধুনিক বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ অর্থনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকলেও কোনো একটি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে থাকে না। ওয়ালেরস্টাইন বিশ্বায়িত অর্থনীতিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন, কেন্দ্রীয় এলাকা (core state) প্রান্তিক এলাকা (peripheral areas), আধা-প্রান্তিক এলাকা (semiperipheral areas)। কেন্দ্রীয় এলাকা (core state) গুলি নিয়ন্ত্রণ করে প্রান্তিক এলাকাগুলি। এবং আধা প্রান্তিক এলাকাগুলি এই জটিল সম্পর্কে (buffer)-র কাজ করে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এলাকা (core state) গুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সংগ্রামে লিপ্ত

থাকে। এই প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ওয়ালেরস্টাইন দেখাতে চান যে বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় (world system) প্রান্তিক এলাকাগুলির পক্ষে সরাসরি উন্নত হয়ে ওঠা বা (core state) এ রূপান্তরিত হওয়া, অর্থাৎ উন্নত ও আধুনিক হয়ে ওঠা কিন্তু সহজ বা সরল কোনো প্রক্রিয়া নয়।

আধুনিক হয়ে ওঠার তাগিদে ক্রমশ যান্ত্রিক উৎপাদক ব্যবস্থা, অর্থনীতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন কতগুলি অপ্রত্যাশিত ফলাফল ডেকে আনে। এই ফলাফলে মানব সভ্যতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৩.৩.১ সংরক্ষণশীল উন্নয়ন (Sustainable Development)

সংরক্ষণশীল উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যা উন্নয়নের প্রয়োজনগুলোর পাশাপাশি পরিবেশ, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়ে এক ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়নের চেষ্টা করে। যে দেশে উন্নয়ন ঘটছে, সেই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৃদ্ধি যাতে কোনোভাবে ঐ দেশের সম্পদকে নিঃশেষ না করতে পারে সেই দিকে নজর দেয় সংরক্ষণশীল উন্নয়ন। ফলে, দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সম্মান জানিয়ে তৃণমূল স্তরে মানুষের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে, দেশজ প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে পরিবেশ-বন্ধু এমন নীতির প্রণয়ন ও রূপায়ণের দিকে লক্ষ্য রাখে।

উন্নয়নকে সংরক্ষণশীল তখনই বলা যায় যখন তা স্থায়ীভাবে জীবনের গুণমান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মানব সম্পদের ওপর বেশি আকারে বিনিয়োগ ঘটিয়ে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সরুক্ষা) জনসম্প্রদায়ের সার্বিক ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গালসাধনই সংরক্ষণশীল উন্নয়নের উদ্দেশ্য। ১৯৯২ সালে রিও-তে 'কনফারেন্স অন এনভায়রণমেন্ট এন্ড ডেভেলাপমেন্ট' এবং ২০০২তে জোনেস্‌বর্গে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাস্‌টেনেবল্‌ ডেভেলাপমেন্ট' — এই দুটি কনফারেন্সে রাষ্ট্রপুঞ্জ তার সদস্য দেশগুলিকে বেসরকারি স্বেসছাসেবী সংস্থার (NGO) সঙ্গে হাত মিলিয়ে মানবসম্পদের জন্য সংরক্ষণশীল উন্নয়নের আবেদন জানায়।

এবার প্রশ্ন হলো সংরক্ষণশীল উন্নয়নের প্রয়োজন কী? পৃথিবীতে দিন দিন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু জায়গার বা স্থানের বৃদ্ধি বা সম্পদের বৃদ্ধি কোনোভাবেই ঘটছে না। ফলে সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন আছে। যেমন, পনেরোটি শস্য যেমন ভুট্টা, গম, চাল, পৃথিবীর নব্বই শতাংশ মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়। অথচ একই জমিতে বারবার শস্য উৎপাদনে শস্যের গুণাগুণ নষ্ট হয় এবং মাটি ক্রমশ অনুর্বর হয়ে উঠতে থাকে। উন্নতমানের বীজ বপনে প্রয়োজন হয় বিরাট পরিমাণে জল। জলও ক্রমশ অপ্রতুল হয়ে ওঠায়, ল্যাবোরেটরিতে শস্য উৎপাদনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। একই জমিতে শস্যের মধ্যে বৈচিত্র্য এনে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলেও তা সময়সাধ্য। ফলে প্রয়োজন সংরক্ষণকারী উন্নয়ন যেখানে ভেষজ, জৈবিক সার ও প্রাকৃতিক পুষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়। আবার, যেমন পৃথিবীর সত্তর শতাংশ জল কিন্তু তার মাত্র ২.৫ শতাংশেরও কম পান করার পক্ষে উপযুক্ত। জনসংখ্যার দ্রত বৃদ্ধি হওয়ার ফলে নগরজীবনে ক্রমশ মানুষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ফলে বিভিন্ন সমীক্ষা ও রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ জলসংকটে পড়েছেন। যেহেতু কৃষি পরিষ্কার জলেই সম্ভব সে কারণে এই স্বল্প পরিমাণের পরিষ্কার পানীয় জলের সংরক্ষণ প্রয়োজন নয়ত আসন্ন সময়ে

জলসংকট চরম জায়গায় পৌঁছতে পারে। এ কারণে সংরক্ষণশীল উন্নয়নের জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে। খাদ্য শস্য, মাটির উর্বরতা, পানীয় জলের পাশাপাশি শক্তি সঞ্চয়, বনাঞ্চলের সংরক্ষণ ইত্যাদিরও প্রয়োজন নয়ত ভবিষ্যতে এই সব সম্পদ চিরকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং সংরক্ষণশীল উন্নয়ণের প্রয়োজন আছে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অতি আবশ্যক কর্তব্য। সংরক্ষণশীল উন্নয়ণের জন্য দেশজ প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নয়নে তৃণমূল স্তরের অংশগ্রহণ বাস্তবায়িত করা, পরিবেশ-বন্ধু কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো, শস্যের বৈচিত্র্য নিয়ে আসা, জৈবিক সারের প্রচলন ঘটানো, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা, নতুন ধরণের শক্তির ব্যবহার করা যেমন সৌরশক্তি ইত্যাদি, বনাঞ্চল সংরক্ষণ, সব ধরণের ধোঁয়া, ধূলা নিয়ন্ত্রণ করা যাতে দূষণ কম হয়, সর্বোপরি জৈবিক বৈচিত্র্যের প্রতি দরদ ও আবেগ জাগিয়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

একক ৩.৪. ❑ উপসংহার (Conclusion)

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় পৌঁছায় কোনো সমাজ। এই রূপান্তর সর্বক্ষণ, ধারাবাহিকভাবে, ধীরে ধীরে হতে পারে। এই ধরণের পরিবর্তনে সমাজে কোথায় পরিবর্তন, কতটা পরিবর্তন হচ্ছে তা সেই মুহূর্তে হয়ত বোঝা সম্ভব নয়। সময়ান্তরে এই পরিবর্তন চোখে পড়ে। আবার এই পরিবর্তন যে সব সময় উন্নততর, প্রগতিশীল পরিবর্তন হয় এমন নয়। কিন্তু সমাজতত্ত্বে বহুকাল ধরে সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক প্রগতি এই ধারণাগুলির সাহায্য নিয়েছে। এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ধারণাগুলির সম্পর্ক কোথায় এবং প্রগতি ও উন্নয়ন সমার্থক কিনা।

একক ৩.৫ ❑ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (৬ নং)

(ক) সামাজিক বিবর্তন কি?

(খ) সামাজিক প্রগতি কি?

(গ) সামাজিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের মধ্যে কি সম্পর্ক?

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন। (১২ নং)

(ক) সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন কি সমার্থক?

(খ) সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক কোথায়?

(গ) সংরক্ষণশীল উন্নয়ন কেন বর্তমান দেশগুলির ক্ষেত্রে জরুরী?

৩। নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিন (২০ নং)

(ক) সামাজিক প্রগতি কি? সামাজিক উন্নয়ন কি? এই দুটি ধারণা কি সমার্থক?

(খ) সামাজিক জীবনে উন্নয়নের স্বার্থে কতদূর পরিবর্তনের উপাদানসমূহকে সমর্থন করা যায়? আপনার মতামত জানান।

(গ) সামাজিক উন্নয়ন কি বিশ্বের ইতিহাসে সব সময়ই সমর্থন পেয়েছে? তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে উত্তর দিন।

একক ৪ ❑ সামাজিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম (Social Change, Globalization and Mass Media)

গঠন

একক ৪.১ আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়ন

৪.১.১ সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব

৪.১.২ এক ভোগ্যবস্তু হিসাবে সংস্কৃতি

৪.১.৩ সাংস্কৃতিক সমরূপতা

৪.১.৪ সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়িত বাণিজ্য ও বাজারের প্রভাব

একক ৪.২ বিশ্বায়িত সমাজে গণমাধ্যম

একক ৪.৩ উপসংহার

একক ৪.৪ প্রশ্নাবলী

একক ৪.৫ উপসংহার

একক ৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

বিশ্বায়ন (globalization) বস্তুত পশ্চিমী সমাজের এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন। কিন্তু বিশ্বের ইতিহাসের সূত্রপাত কিন্তু বিশ্বায়ন দিয়ে হয়নি। পশ্চিমী ইউরোপে ঊনবিংশ শতক থেকে পুঁজিবাদের যে বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে, বিশ্বায়ন তারই একটি পর্যায় বা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পিছিয়ে থাকা অবস্থায় পরিবর্তন আসে। ফলে, যেমন আধুনিকতার লক্ষ্যে, উন্নয়নের বা প্রগতির লক্ষ্যে সমাজ এগোতে থাকে, তেমনি বঞ্চনা, শোষণ, দমন ও বৈষম্যেরও এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে আধা-ঔপনিবেশিক বা ঔপনিবেশিক এলাকাগুলিতে জাতীয়তাবোধের তীব্র চেতনাও জাগ্রত হয়ে ওঠে। উঠতি, সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলির কাছে উন্নয়নের মডেল হয়ে ওঠে 'আধুনিকতা'। এই আধুনিকতার জয়ডঙ্কা ও তার ধ্বজাধারী প্রগতির ধারণাও স্বপ্ন এই অর্থনীতিগুলিকে ক্রমশ গ্রাস করে।

বিশ্বজুড়ে একই অর্থনৈতিক বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থা কায়েম করতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি নতুন যে প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানালো বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, সেই প্রক্রিয়া হলো বিশ্বায়ন। কিন্তু বিশ্বায়ন ঘটলো নানা বিশ্বের। অর্থাৎ বিশ্বায়ন বিভিন্ন রূপ নিল। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন নজর দিল বিশ্বায়িত বাজার ব্যবস্থায় যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই দেশের ও জাতির সীমানা অতিক্রম করে বাজার ব্যবস্থাকে কায়েম করবে এবং টিকিয়ে রাখবে।

রাজনৈতিক বিশ্বায়ন হল জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ক্রমশ অস্থিত হয়ে ওঠা বিশ্বায়িত জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় হ্রাস টানা যাতে বিশ্বায়িত অর্থনীতি জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বাজার-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন হলো বিশ্ব জুড়ে সাংস্কৃতিক সমতা স্থাপন করা। এর ভিত্তিই হলো যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি। অর্থাৎ, গণমাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের, সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভোগবাদিতার সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। এই ভোগবাদিতার সংস্কৃতির এক বিশেষ একশিলা (monolithic) চরিত্র আছে। অর্থাৎ মানুষ পশ্চিমী সংস্কৃতির দর্শন ও মূল্যবোধকে না বুঝেই তাকে শুধুমাত্র বিনোদনের আঙ্গিকে গ্রহণ করে। আবার বিশ্বয়ায়িত এক সমতাপূর্ণ সংস্কৃতির প্রচার করলেও বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বায়িত সংস্কৃতি এক সমরূপ সংস্কৃতির প্রচার চালায়।

একক ৪.১ ❑ আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়ন (Modernization and Globalization)

বহু দূর বিস্তৃত অঞ্চলের সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বিশ্বায়নের মাধ্যমে। বিশ্বায়নের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন হলেও আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। অ্যান্টনি গিডেন্স (১৯৯০, ৬৪) দেখিয়েছেন বিশ্বায়ন কিভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায়। এই ক্ষেত্রগুলি হলো বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী অর্থনীতি, জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিশ্বায়িত ক্ষেত্রে এক সামরিক ব্যবস্থা স্থাপন ও আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন। এই ক্ষেত্রগুলির কার্যকারিতা বস্তুত আধুনিকতার চারটি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘটে। যেমন, পুঁজিবাদ, অতন্দ্র প্রহরা (surveillance), সামরিক ক্ষমতা ও শিল্পব্যবস্থা। গিডেন্স পুঁজিবাদ ও শিল্পবাদকে (industrialism) দুটি ভিন্ন পরিচয়ে দেখেন। পুঁজিবাদ, তাঁর মতে হলো মজুরিভিত্তিক শ্রমের পুঁজির মালিকানা এবং শিল্পবাদ হলো মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিশ্বের অর্থাৎ পরিবেশের সম্পর্ক। এই বিশ্লেষণ থেকে দেখলে, আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন অর্থ, আঞ্চলিক সম্পর্কগুলির সীমিত পরিসর ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে সেই সম্পর্কগুলিকে এমনভাবে হাজির করছেন যা আগে কখনো কল্পনা করা যায়নি। তবে গিডেন্স যেভাবে দেখিয়েছেন যে বিশ্বায়ন হলো আধুনিকীকরণের একটি ফলাফল তার সমালোচনাও হয়েছে। তার মধ্যে মুখ্য সমালোচনা হলো গিডেন্স এই ধারণায় কখনো সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও তার প্রভাবের উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ সমালোচকদের মতে বিশ্বায়ন ধারণাটি একদিকে বিশ্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপণ আবার অন্যদিকে বিশ্ব সম্বন্ধে এক বিস্তৃতির ধারণা। এই মর্মে বলা যেতে পারে বিশ্বায়ন হলো এক দ্বৈত ব্যবস্থা যেখানে বিস্তৃতির পাশাপাশি চলে সংক্ষেপায়ণ। এই দুটি প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেমন, আধুনিক মূল্যবোধের কাটাছেঁড়ার প্রভাব পড়েছে বহু অ-পশ্চিমী সমাজে আবার, বিশ্বায়নই কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনীতিকরণের মাধ্যমে তার আঞ্চলিক পরিচয়ের সীমাকে উস্কে দিয়েছে। ফলে, সংস্কৃতি তার আঞ্চলিক পরিচিতি ও আঞ্চলিক নোঙরচ্যুত। ফলে এক নতুন ধরণের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে যা ভোগবাদিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গণমাধ্যম নির্ভর, এক সমরূপ সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে ।

৪.১.১ সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব (Impact of Globalization on Culture)

বিশ্বায়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর এমন প্রভাব পড়েছে যে জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ব এসে পৌঁছেছে সবার কাছে। ফলে আঞ্চলিক স্তরের সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো যেমন

পরিবার ইত্যাদির ওপর এর প্রভাব অপরিসীম। 'বিশ্বায়িত সংস্কৃতি' (global culture) এই ধারণাটি এখন বিশ্বজুড়ে এক সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতার ব্যাপ্তি বোঝাচ্ছে এবং পাশাপাশি বিশ্বায়িত ক্ষেত্রে পরিচয়ের সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের বিশেষ ব্যাপ্তি ও সাংস্কৃতিক সচেতনতাকেও নির্দিষ্ট করে একদিকে, আধুনিক মূল্যবোধ ও ব্যবহারের প্রচার অ-পশ্চিমী সমাজগুলির সনাতন ভাবধারার ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং অন্যদিকে বিশেষ কোনো স্বার্থ-গোষ্ঠীর রাজনীতিকরণের ফলে বিশ্বায়ন নতুন এক সীমানাও টেনেছে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমে এক নতুন ধারণা গড়ে উঠেছে যে সনাতনী ধারণায় সংস্কৃতি বলতে যা বোঝাত তার শিকড় আগের থেকে আলগা হয়ে গেছে। এর দুটি দিক আছে। এক, পশ্চিমী সংস্কৃতি বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে শুধুমাত্র অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তারই নয় পশ্চিমী সংস্কৃতির ওপরও এর প্রভাব পড়েছে। যেমন, ভাষার ক্ষেত্রে, ইংরাজি শুধমাত্র ইংরাজি বলিয়ে দেশের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরণের ইংরাজি ভাষার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে, দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি ঘটছে তা হলো সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি নিজেই নিজের আধিপত্যের শিকার হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, আধুনিকীকরণের বাজারে আধুনিকীকরণ একটি ভোগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। রিৎজার এই প্রক্রিয়াকে 'ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন' (Mcdonaldization) বলেছেন। আধুনিক হয়ে ওঠার নামে আধুনিকীকরণ এক ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে ওঠা।

৪.১.২ এক ভোগ্যবস্তু হিসাবে সংস্কৃতি (Culture as a Commodity)

১৯৪৭-এ ম্যাক্স হরখাইমা-র 'সাংস্কৃতিক শিল্প' (cultural industry) ধারণাটির মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন বিশ্বজুড়ে যে সংস্কৃতির প্রচার চলছে তা জ্ঞানদীপ্ত যুগের (enlightenment age) বিরোধী। যেখানে জ্ঞানদীপ্তি, যা হলো প্রকৃতির ওপর প্রযুক্তিগত আধিপত্যের ক্রমশ প্রগতিশীল এক প্রক্রিয়া, তা গণমোহিনী রূপ নিচ্ছে এবং চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধক শক্তি হয়ে উঠছে। এই সংস্কৃতি স্বয়ংক্রিয়, স্বাধীন ব্যক্তির গঠনকে প্রতিহত করছে। এক্ষেত্রে এডর্নো দেখান এই সাংস্কৃতিক শিল্পক্ষেত্র পুরনো ধ্যান ধারণাও এক নতুন গুণ যোগ করে। যেমন এই সাংস্কৃতিক শিল্প ভোগবাদিতাকে প্রাধান্য দেয়, যিনি খরিদ্দার তাকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলে যে সে নিজেকে 'রাজা' মনে করতে শুরু করে কিন্তু বাস্তবে এই খরিদ্দার সাংস্কৃতিক শিল্পক্ষেত্রের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে এডর্নো গণমাধ্যমের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন এবং বলেন যে এই গণমাধ্যম সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না বা যোগাযোগের প্রযুক্তি বা তার উন্নয়নের কথা ভাবে না কিন্তু শুধুমাত্রই গণমোহিনী এক পরিবেশের সৃষ্টি করতে চায়। সেক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক শিল্পের সাংস্কৃতিক ভোগ্যবস্তুগুলি শুধুই নিজেদের বাজারী মূল্য নির্ধারণে ব্যস্ত থাকে, কখনোই তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর ওপর দৃষ্টিপাত করে না।

৪.১.৩ সাংস্কৃতিক সমরূপতা (Cultural Homogeneity)

বিশ্বায়নের ফলে সংস্কৃতি অন্য যে কোনো বস্তুর মতই বাজারের একটি ভোগ্যবস্তু। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় মুনাফা তুলেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রতিটি সংস্থার নিয়ন্ত্রক বা এই সংস্থাগুলি মার্কিনী। ফলে, বিশ্বায়িত সংস্কৃতির নামে যা প্রচারিত হচ্ছে আদতে তা সবই মার্কিনী সংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতি কাকে বলে এই সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক

বিশ্লেষণ বলে সংস্কৃতি ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিশ্বায়িত সংস্কৃতির উপস্থিতি থাকতে পারে না। আঞ্চলিক স্তরের সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই বিশ্ব মানবতার ধারণায় উদ্ভাসিত বিশ্বায়িত সংস্কৃতি প্রকাশিত হয়। এর কারণ বিশ্বায়িত সংস্কৃতি একটি বিমূর্ত ধারণা কিন্তু আঞ্চলিক সংস্কৃতি তার বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষযুক্ত। তাছাড়া আঞ্চলিক সংস্কৃতি তো কোনো প্রভাবশূন্য বিষয় নয় বা তার মধ্যে কোনো স্তরের বা ভিন্নতার প্রকাশ নেই এমন নয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যেও আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তি, প্রবরতা প্রকাশ করে এমন উপাদান আছে যা নিম্নবর্গ বা লোকায়ত উপাদানের বিরোধী। সেক্ষেত্রে বিশ্বায়িত সংস্কৃতির প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতির এই বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। অথচ, বিশ্বায়িত সংস্কৃতির লক্ষ্যই হলো সব সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে মুছে দিয়ে রুচি, মূল্যবোধ, চাহিদা, অগ্রাধিকার সব কিছুরই এক মাননির্ধারী কর্তৃত্বকারী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এক, বিশ্বায়িত সংস্কৃতির নামে যে মার্কিনী সংস্কৃতি প্রচারিত হচ্ছে সেই সংস্কৃতি আদতে পশ্চিমী সমাজের শাসক শ্রেণির সংস্কৃতি। এর লক্ষ্য হলো মূল্যবোধ, ব্যবহার, প্রতিষ্ঠান এমনকি দলিত জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের প্রতিষ্ঠার লড়াই, সবই সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণির স্বার্থের সহযোগী। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়িত সংস্কৃতির নামে যা কিছু প্রচারিত হচ্ছে সবই কিন্তু মার্কিনী বা পশ্চিমী ধনী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নয়, অনেক আঞ্চলিক সংস্কৃতিও পশ্চিমী বিশ্বায়িত সংস্কৃতির ছাতার তলায়, একই নামে প্রচার পাচ্ছে। কিন্তু মার্কিনী, বিশ্বায়িত গণমাধ্যমের প্রচারের সাহায্য না পেলে এই আঞ্চলিক সংস্কৃতি কখনোই এত প্রচার পেত না। আবার, এই আঞ্চলিকতা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি যে হুবহু বিশ্বায়িত ক্ষেত্রে প্রচার পাচ্ছে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। যেটুকু প্রচারিত হচ্ছে তা কর্তৃত্বকারী বিশ্বায়িত সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। অর্থাৎ বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী স্বার্থের সঙ্গে যতটুকু আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সত্ত্বার প্রকাশ সাযুজ্যপূর্ণ শুধু সেটুকুই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বিশ্বায়িত ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি প্রচারিত হচ্ছে তা প্রকৃত অর্থে শুধুই মার্কিনী এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেক সময়ই মার্কিনী সংস্কৃতিকে বিশ্ব বাজার ও অন্যান্য আঞ্চলিক স্তরের সংস্কৃতিক উৎপাদনের বিপক্ষ শক্তি হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা বিশ্বায়নের সপক্ষে যুক্তি সাজান তারা দেখান যে আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে ক্রেতার কাছে বাছাই করার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিশ্বায়িত বাজার যত বৃহৎ ও বিস্তৃত হবে, তত বেশি সংখ্যায় শিল্পী ও শিল্প সাহায্য পাবে। যেমন, সম্পদশালী ক্রেতা আন্তর্জাতিক স্তরের শিল্পকর্মের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প ক্রয়েরও ইচ্ছা রাখবেন। অতএব, একদিকে বাছাই করার ক্ষেত্র ক্রমশ সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হবে আবার অন্যদিকে এই একই সাংস্কৃতিক বাছাই-এর ফলে অগভীর ভোগবাদিতার অভ্যাসে মানুষ দাসে পরিণত হবে।

৪.১.৪ সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়িত বাণিজ্য ও বাজারের প্রভাব (The Impact of globalized trade and Market on culture)

কোনো সংস্কৃতিই বিশ্বজুড়ে ধারাবাহিক কোনো পরিবর্তনের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের মাধ্যমে কখনো কোনো সংস্কৃতি তার নিজস্ব পরিচয় হারায় আবার কখনো নিজস্ব পরিচয় বজায় রেখে বাহ্যিক ক্ষেত্রের থেকে প্রাপ্ত

উপাদানকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। এবার প্রশ্ন হলো সংস্কৃতির মূল্যবোধ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই দেওয়া-নেওয়ার মূল্যায়ন সম্ভব কীভাবে? দ্রুত হারে পরিবর্তনের সময়ে সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে সংস্কৃতির সহনশীলতা (resilience) এর ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজে এই ধারাবাহিক ও দ্রুত পরিবর্তনের সময়ে কোন্ কোন্ দিকগুলি অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছে তার উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করা, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সমাজে সাংস্কৃতিক দেওয়া নেওয়া বা বিনিময় চলছে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অভিযোজন, ঐক্যসাধন, আত্তীকরণ ঘটছে তা দেখা এবং পাশাপাশি পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সাংস্কৃতিক পুনর্মূল্যায়ন কীভাবে ও কোথায় কোথায় ঘটছে তা দেখা।

একদিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনো দেশের বাজার বিশ্বায়িত পণ্যের জন্য অপেক্ষা করছে আবার এর ফলে সনাতনী, ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম ও রুচিতে আঘাত আসছে। এর ফলে, ঐতিহ্যবাহী সমাজে যা কিছু শুধুই সাংস্কৃতিক রীতিবদ্ধতায় আবদ্ধ ছিল, বিশ্বায়িত ক্ষেত্রে তাও বাজারী পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। যার জন্য লোকায়ত সংস্কৃতির স্বাধিকার হারিয়ে যাচ্ছে, এমনকি বিশ্বায়িত বাজারভিত্তিক সমাজে শিল্পকর্মের সঠিক মূল্যায়নের জন্য যে নতুন সম্পর্কের জাল স্থাপন করা প্রয়োজন, তার জন্য মানুষের জীবনে স্থিতাবস্থা হারাচ্ছে। সমাজে বিশ্বায়িত সমাজ ও লোকায়ত, আঞ্চলিক সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উদ্ভব হচ্ছে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাদের শিক্ষা ও অর্থ দুই আছে কিন্তু যারা দেশজ শিল্প সত্ত্বাকে অনেক সময়ই শোষণ করে বা দহন করেই বিশ্বায়িত বাজারে মুনাফা করার চেষ্টা করছে। আবার যারা সাংস্কৃতিক পরিচয়হীন এবং অর্থনৈতিকভাবে অশক্ত সেই সম্প্রদায়গুলি ক্রমশ বিশ্বায়িত বাজার ব্যবস্থায় নিজেদের স্বকীয়তা পরিচয় হারিয়ে ফেলছেন। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এক অদ্ভুত সংস্কৃতির উপস্থিতি চোখে পড়ছে — একদিকে আধুনিক প্রযুক্তিবদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ আবার অন্যদিকে আঞ্চলিক বাস্তবতায় ঐতিহ্যবাহীতার প্রকাশ স্বাচ্ছন্দ ও মননের প্রতি আকর্ষণ। ফলে দেশের মধ্যে বিস্ময়রূপ সংস্কৃতি ও বহুমাত্রিক সামাজিক কাঠামো আঞ্চলিক স্তরের স্বকীয়তাকে হারিয়ে ফেললেও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতি ভেঙে পড়ে না। ফলে দেশজ সংস্কৃতিতে অভিযোজন ঘটলেও তা কখনই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। ফলে বিশ্বায়িত সমাজে সংস্কৃতিকে তিনটি পর্যায়ে জানার প্রয়োজন হয়। এক, বিশ্বায়িত, বিশ্বজনীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংস্কৃতি, আধুনিক শিল্প, আমলাতন্ত্র, যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগের উন্নততম বিন্যাস। দুই, জাতীয় সংস্কৃতির ক্রমশ প্রকাশ যা দেশের এক বিশেষ পরিচিতিতে পর্যবসিত হয়। তিন, আঞ্চলিক প্রাদেশিক সংস্কৃতি, প্রব্রজক গোষ্ঠীর সংস্কৃতি যেখানে ছেড়ে আসা সংস্কৃতি ও গন্তব্যের সংস্কৃতি এই দুই ধরণের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটায়। এই নতুন পরিস্থিতিতে আদর্শের সমালোচনা না করে, পরিবর্তনের পথগুলির সঠিক মূল্যায়ন করে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হওয়াই উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

একক ৪.২ ❑ বিশ্বায়িত সমাজে গণমাধ্যম (Mass Media in Globalized Society)

বিশ্বায়িত সমাজে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম, যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার (পরিগণক), স্যাটেলাইটের সাহায্যে বৈদ্যুতিন পত্রালি (electronic mail) ইত্যাদি, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য, পরিচালন

ব্যবস্থাকে এমনকি সংস্কৃতি বা অবসরকালীন সময়যাপনকেও সম্পূর্ণ বদল করে দিয়েছে। এই গণমাধ্যমগুলি আন্তর্জাতিক, জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে দেশের সার্বভৌমত্বকে ছাপিয়ে মানুষের বাছাই করার ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। এই গণমাধ্যমে প্রচারিত সংস্কৃতি সময়, অঞ্চল ও সাংস্কৃতিক প্রতীক সমূহকে অগ্রাহ্য করে এমন এক পরিবর্তন এনেছে যা বহুপর্যায়ী ও বহুমুখী।

সমকালীন সময়ে টেলিভিশন যুগে কেউ যদি সংবাদ দেখতে চান তাহলে তার কাছে অনেকগুলি বাছাই করার মত সম্ভাবনা দেখা যায়। আমরা যে অখণ্ড বিশ্বে বসবাস করছি সেখানে যোগাযোগসমূহের আন্তর্জাতিক প্রসার ঘটার ফলেই তা সম্ভব হচ্ছে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখছেন। এর বাজার বিশাল এবং সারা বিশ্বে বিস্তৃত। এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে বিশ্ব-তথ্য-বিন্যাস ব্যবস্থার মাধ্যমে। তথ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভবপর হচ্ছে। কিন্তু এই বিন্যাসে অসমতার ছাপ স্পষ্ট। যেমন, সংবাদ প্রবাহের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় মুষ্টিমেয় সংবাদ সংস্থার দ্বারা, যেমন, রয়টার, হাবাস অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ইত্যাদি। বিশ্বজুড়ে মাত্র চারটি সংস্থা মিলিতভাবে দৈনিক ৩৪ মিলিয়ন শব্দ প্রেরণ করে এবং বিশ্বব্যাপী সব সংবাদ পত্র, দূরদর্শন ইত্যাদিকে সংবাদ সরবরাহ করে। শুধু সংবাদই নয় সিনেমা-শিল্পে বৃহৎ গণমাধ্যম নিগমগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় শাখার মাধ্যমে সারা বিশ্বে আধিপত্য চালাচ্ছে। বড় পর্দার ছবি বাদ দিয়েও এই নিগমগুলির শুধুমাত্র রপ্তানি আয়ই বিরাট অঙ্কের।

সারা বিশ্বে শিল্পোন্নত দেশগুলির গণমাধ্যম, উৎপাদন ও ব্যাপ্তিতে, গণমাধ্যমের এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত কেননা গণমাধ্যমে প্রচারিত সংস্কৃতির জেরে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শুধুমাত্র বিনোদন নয়, প্রথম বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী সংবাদের মধ্যেও যেভাবে প্রভাব ফেলছে তাতে তৃতীয় বিশ্বের জনজীবন ও সংস্কৃতি, কোনো বিশেষ দুর্ঘটনা ছাড়া কোনো কিছুই বিশ্ব সংবাদ পরিবেশনে স্থান পায় না অথচ পশ্চিমী তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়গুলি সহজেই তৃতীয় বিশ্বের সংবাদ পরিবেশনের বাজারে স্থান পায়। একেই বলে গণমাধ্যম সাম্রাজ্যবাদ (Media Imperialism)।

বিশ্বের গণমাধ্যম ব্যবসায়ীদের উত্থান এবং বিশ্ববাজারে গণমাধ্যম নিগমগুলির প্রভাব বিশ্ববাজারে গণমাধ্যম নিগমগুলির প্রভাব বিশ্বায়িত যুগে অনস্বীকার্য। এই নিগমগুলির ও ব্যবসায়ীদের বাজার কেন্দ্রিক মনোভাবকে জাতি রাষ্ট্রগুলি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা সেই আলোচনার ফলে গড়ে ওঠে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের (media regulation) বিষয়টি। আধুনিক অর্থনীতিতে গণমাধ্যম হল দ্রুততম বিকাশমান ক্ষেত্র, সেক্ষেত্রে গণমাধ্যম ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বা অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাধা কোনোভাবেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। ব্যবসায়ীরা মনে করেন অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করলে বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসুবিধা হবে। এবং তারা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় হারিয়ে যাবেন। এ কারণে নিয়ন্ত্রণের বিষয় ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হলেও এ বিষয়ে এখনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।

প্রযুক্তির অতি দ্রুত পরিবর্তনের ফলে, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। নিত্য নতুন কলা কৌশল যেমন ইন্টারনেট ও বহুমুখী গণমাধ্যমের বিষয়টি বিশ্বায়িত গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন।

কমপিউটার আমাদের জীবনে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এখন কম্পিউটার। উপগ্রহ যোগাযোগের ফলে দূর যোগাযোগ প্রযুক্তির এক বিশেষ ও নতুন সংযোজন ঘটিয়েছে। ব্যক্তিগত কমপিউটার এখন একই সাথে টেলিভিশন, কেবল্ ও উপগ্রহের প্রবেশ পথে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনও হতে পারে যে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যতে মানুষের কাছে টেলিভিশনের গুরুত্ব কমে যাবে।

ব্যক্তিগত কম্পিউটার চলে ঘরে ঘরে অন্-লাইন ক্রিয়াকলাপ বাড়িতে বসেই সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক বিনিময়, পত্রালি, যোগাযোগ ইত্যাদি সফটওয়্যারের প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করছে। ইন্টারনেটের প্রধান অংশ হলো বিশ্বব্যাপী তরঙ্গ সৃষ্টি (World wide web বা www)। এটি একটি বিশ্বব্যাপী বহুমুখী গণমাধ্যম গ্রন্থাগার। এর সাহায্যে বিশ্বের যাবতীয় খবর সংগ্রহ এখন হাতের মুঠোয়। শুধুমাত্র খবরই নয়, তথ্যভাণ্ডার বলা যায় এই নতুন গণমাধ্যমকে। এই নতুন গণমাধ্যমটির মাধ্যমে যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে সেখানে বস্তুত মানুষের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না — পর্দায় কতগুলি বার্তাকে অনুসরণ করেই তথ্যের গন্তব্যে পৌঁছনো সম্ভব হয়। বৈদ্যুতিন পত্রালি (e-mail) ব্যবস্থা ব্যবহারকারী একে অপরকে চিহ্নিত করে, ইন্টারনেট এইভাবেই মানুষের অস্তিত্বহীন এক ক্ষেত্র গড়ে তুলছে যাকে বলে সাইবার স্পেস (cyber-space)। এই জনক্ষেত্রহীন ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের যুক্ত করছি কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণের বদলে নিজেরাই এর গতিপথে ভেসে যাচ্ছি। এই নতুন বিশ্বায়িত গণমাধ্যম আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই সংযুক্তির সংস্কৃতিতেও আমরা বিপন্ন ও একা ও আপাতবাস্তব জগতে এক দুঃখজনক জীবনযাপনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে উৎসাহী হয়ে উঠছি। তার কারণ যোগাযোগ সমন্বিত সাইবার স্পেস কখনোই রক্তমাংসের মানুষের মিথস্ক্রিয়ার বিকল্প হতে পারে না। বিশ্বায়িত জগৎ এখনও এর বিকল্প খুঁজছে।

একক ৪.৩. ❑ উপসংহার (Conclusion)

সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে এক এক ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। কখনো তা প্রগতির তত্ত্ব আবার কখনো নির্ভরতার তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে যে গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে তার একটি অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো গণমাধ্যমের উত্থান, প্রচার ও ব্যাপক পরিধি লাভ করা। ফলে বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগে গণমাধ্যম ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা।

একক ৪.৪ ❑ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (৬ নং)

(ক) বিশ্বায়িত গণমাধ্যম কি?

(খ) গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ কি?

(গ) সাংস্কৃতিক সমরূপতা কাকে বলে?

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন। (১২ নং)

(ক) আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়ন কি একই প্রক্রিয়া?

(খ) সাংস্কৃতিক সমরূপতা কি বিশ্বায়নের সৃষ্টি?

(গ) বিশ্বায়নের ফলে গণমাধ্যমে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

৩। নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিন। (২০ নং)

(ক) বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখুন।

(খ) বিশ্বায়নের ফলে গণমাধ্যমে কি কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে সে সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) বিশ্বায়ন, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি এর মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক গঠিত হয়েছে?

একক ৪.৫ ❑ উপসংহার (Conclusion)

সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজতত্ত্ব যা আলোচিত হয়, তা হলো স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা। সমাজতত্ত্ব মনে করা হয় স্থিতিশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজকে দেখার দৃষ্টিকোণ যেমন প্রয়োজনীয় ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনশীলতার আলোচনা। এই মডিউলে আমরা সমাজের পরিবর্তনশীলতার আলোচনায় পরিবর্তন বিশেষত কিভাবে পরিবর্তন হয়, কোন্ কোন্ ধারণা এক্ষেত্রে গুরুত্বপায় ও সমকালীন সময়ে পরিবর্তনের ধারার স্বরূপটি কেমন তা আলোচনা করা হলো।

একক ৪.৬ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

গিডেন্স, এ, (১৯৯৮) সোসিওলজি,
তৃতীয় সংস্করণ, লন্ডন, পলিটি প্রেস

জন্সন, হ. এম, (১৯৬০), সোসিওলজি : এ সিস্টেম
ইনট্রোডাক্শন, নিউ ইয়র্ক, হারকোর্ট, ব্রেস এন্ড ওয়ার্ল্ড ইঙ্ক।

ম্যাকাইডার, আর. এস, (এন্ড) পেজ, চ. (২০০৯),
সোসাইটি এন ইন্ট্রোডাকটরি অ্যানালিসিস দিল্লি,
সুরজিৎ পাবলিকেশন্স, সেকেন্ড ইন্ডিয়া রিপ্রিন্ট

স্মেল্‌সর, এন. জে., (১৯৯১), সোসিওলজি,
নিউজার্সি, প্রেন্টিস — হল, ইঙ্ক

অ্যাব্রাহাম, ফ. (২০০৬), কন্‌টেম্‌পোর‍্যারি সোসিওলজি,
এন ইন্ট্রোডাক্‌শন টু কন্‌সেপ্টস্‌ এন্ড থিওরিজ,
নিউ দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

বেল্‌ ড্যানিয়েল (১৯৭৬), দি কামিং অব পোস্ট
ইন্ডস্ট্রিয়ল সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক, সিলিয়র

দেশাই, এ. আর (১৯৭৬), (সংকলিত), এসেজ অন
মডার্নাইজেশন অব আন্ডার ডেভেলাপট্‌ সোসাইটিজ,
অ্যাটলান্টিক হাইল্যান্ডস্‌ : হিউমেনিটিজ প্রেস

Notes

Notes